সপ্তম অধ্যায়
উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষা : একটি স্বতন্ত্র নিরীক্ষা

''সচেতন পাঠক হিসেবে যখন পড়ি, আসলে আমরা তখন লিখি, বা বলা ভালো, পুনর্লিখন করি। লেখকের পরিসরকে সর্বগ্রাসী বলে মানি না কিছুতেই, পড়ুয়ার পরিসরকে নিরন্তর প্রসারিত করে চলি। কেননা তাৎপর্যে পৌঁছাতে হবে আমাদের; একক পাঠে এই প্রক্রিয়া শেষ হয় না বলে পুনঃপাঠের পরম্পরা চলতে থাকে। পর্ব থেকে পর্বান্তরে কাল থেকে কালান্তরে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে।''[১]

বস্তুত সাহিত্য পাঠ একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। এক প্রজন্মের পাঠকের সঙ্গে অন্য প্রজন্মের পাঠকের মধ্যে একই রচনা ভিন্ন আবেদন নিয়ে দেখা দেয়। সেই আবেদনে পূর্বসূরীকে পুরোপুরি অস্বীকার করে নতুন কোন বার্তা পাঠক দিয়ে থাকেন, অথবা পূর্বসূরীর মতকে স্বীকৃতি দিয়ে অতিক্রমণের একটা শিল্পীত প্রয়াস থাকে। হুবহু পূর্বসূরীর বিবৃতির ফটোগ্রাফী নির্মাণ করা সচেতন সাহিত্য পাঠকের ধর্ম নয়। সাহিত্য বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার মধ্যে এই পাঠক প্রতিক্রিয়া উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। শুধু পাঠক পরম্পরা নয় লেখকের সঙ্গেও পাঠকের ভাবনার একটা দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়ে যায়। সেজন্য সমকালে পাঠকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে শিল্পোচিত আলোচনার পরিসর পেতে পারে অনায়াসেই। তাই লেখক থেকে পাঠক, পাঠক থেকে উত্তরকালের পাঠকের মধ্যে একটি সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিগত দূরত্ব অনিবার্যভাবে তৈরী হয়ে যায়। যেহেতু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের দেখার চোখ বদলে যায়। স্বভাবতই কোনো রচনা পড়তে পড়তেই মনের মধ্যে একটা কথন-বিশ্ব তৈরী হয়ে যায়। ধরা যাক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' উপন্যাসটির কথা। ১৮৭৮ সালে উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ছয় মাস ধরে প্রকাশের পর তা বন্ধ হয়ে যায়। গল্প অসম্পূর্ণ থাকে। তিন বছর পরে ১৮৮২ সালে পুস্তকাকারে এটি প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এটিকে উপন্যাস না বলে 'ক্ষুদ্রকথা' বলেছিলেন। প্রথম সংস্করণে পৃষ্ঠা ছিল ৮৩। পরে ১৮৯৩ সালে চতুর্থ সংস্করণে এর কলেবর বৃদ্ধি করে করা হয় ৪৩৪ পৃষ্ঠা। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই চতুর্থ সংস্করণেই

এটি উপন্যাসের আকার পায়। পরবর্তীকালে ১৯৯৮ খ্রীঃ শতবর্ষ অতিক্রম করে একজন সমালোচক—পাঠক উপন্যাসটি নিয়ে তাঁর মত করে আলোচনা করলেন। সেই আলোচনা থেকে সরে এসে ২০১৭ সালে যদি আরেকজন সচেতন পাঠক উপন্যাসটির পুনঃপাঠ ও আলোচনা করেন তাহলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। এইভাবে সাহিত্যের সমালোচনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় এবং সেই বদলে যাওয়া সময়ের নিরীখে রচয়িতার এবং তাঁর রচনার পুনমূর্ল্যায়ন হয়ে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরী এবং কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের চাইতে কিছুটা বয়ঃজ্যেষ্ঠ জগদীশগুপ্ত যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে এলেন তখন স্বভাবতই তিনি তাঁর মত করে একটি ক্ষেত্র রচনা করেছেন। সমকালের পাঠকের কাছে তিনি নিন্দিত ও নন্দিত উভয়ই হয়েছেন। তাঁর রচনার মূল্যায়ন হয়েছে অথবা অংশত হয়েছে। সচেতন পাঠক হিসেবে তাই উত্তরকালে জগদীশগুপ্তের উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে পড়ুয়া হিসেবে আমাদের পরিসর নিরন্তর বেড়েছে। পুনঃপাঠে কোন রচনা সম্পর্কে পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। আবার সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকৃতি দিয়েও নতুন কিছু বলার তাগিদ অন্তরে অনুভূত হচ্ছে। তিনি তাঁর জীবিতকালে (১৮৮৬-১৯৫৭) মাত্র কয়েকটি উপন্যাস লিখে গেছেন। প্রথম উপন্যাস 'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯) এবং শেষ উপন্যাস 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০) তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে তার রচিত উপন্যাস মাত্র ১৭টি। এই স্বল্প সংখ্যক রচনার মধ্যেই ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখে গেছেন।

জগদীশগুপ্তের নিজের রচনা সম্পর্কে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গির বিক্ষিপ্ত কিছু পরিচয় প্রথমেই আলোচনা করা যেতে পারে—

■ কুষ্ঠিয়া থেকে ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুকে একটি চিঠিতে জগদীশ গুপ্ত লিখেছিলেন—

''যে বইখানা আপনাকে পড়িতে দিয়াছি ওখানা ঠিক নাটক নয়, কি যে তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। ঐ স্বপ্নের গল্পটা ছাড়া আরও একটি গল্প লিখিয়াছি। আপনার কাজের ভার একটু হাল্কা হইয়াছে যখন মনে হইবে, তখন পাঠাইব। গল্পটি ভালই হইয়াছে বলিয়া মনে

হয়।...

উপন্যাস লেখা আমার পক্ষে দুরূহ—অসম্ভবই।"[২]

■ খিদিরপুর, কলকাতা থেকে ৭ই জানুয়ারী ১৯২৭ খ্রীঃ মুরলীধর বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছেন—

"... এইবার আপনার সঙ্গে আমার যথার্থ মতানৈক্য ঘটিল। গল্পটি আদৌ Stale হয় নাই।—প্রেম নয়, ত্যাগ নয়; শুধু, সুবর্ণের লোভের ভিতর দিয়া, সামান্য ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া, ব্যক্তি যতটা সম্ভব ফুটিতে পারে, তাহা ফুটিয়াছে। ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া ঘটনা এবং তাহার পরিণতিকেই যদি প্রাধান্য দেওয়া যায়, তবে গল্প হিসাবে খুব দোষের বলিয়া আমার মনে হয় না। আপনারা যাহাকে 'বিস্বাদ' বলিতেছেন, সেটা গল্পের বিস্তৃতি।"[৩]

■ 'রোমন্থন' উপন্যাসের 'ভূমিকা' অংশে জগদীশবাবু লিখেছেন—

"ইহাতে 'প্লট্' নাই আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র; গল্প তৈরী আমার উদ্দেশ্য নয়।

উপন্যাস সুলভ গল্পের বস্তুসংস্থান বা পরিপুষ্টি ইহাতে নাই।..। ঘটনাগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একস্থানে যাইয়া ফল প্রসব করিতেছে। ঘটনার কল্পনায় গভীরতা থাক্ আর নাই থাক্, পল্লীর সঙ্গে মনের নিবিড় আত্মীয়তা জন্মিবার পক্ষে তাহা সুদূরাগত বা প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইতে পারে কিনা তাহাই বিবেচ্য।

উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীনে আনিয়া হইাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের বিচার করেন তবে আমি বিস্মিত হইব না।"[৪]

■ জগদীশ গুপ্তের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর শেষ উপন্যাস 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০)। উপন্যাসটির ভূমিকা লিখেছিলেন শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায়। 'ভূমিকা' অংশে তিনি জানিয়েছেন, উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি বহুকাল পূর্বে লেখক দিয়েছিলেন কোনো একজন প্রকাশককে। সেজন্য তিনি কিছু অগ্রিম টাকাও নিয়েছিলেন। ঐ প্রকাশক উপন্যাসটির কলেবর বৃদ্ধির জন্য এবং অংশ বিশেষ অপেক্ষাকৃত রসঘন করে তোলার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু লেখক সরাসরি সেই আবেদন অগ্রাহ্য করে দিয়ে মুখের উপর বলেছিলেন—

''উপন্যাস যেখানে যখন সমাপ্ত হওয়া প্রয়োজন এবং যে ঘটনা বিস্তারের যতটুকু ক্ষেত্র আছে, তার বেশী কোন ফরমাশী লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।''[৫]

লেখকের নিজের রচনা প্রসঙ্গে মন্তব্যগুলিকে পরপর সাজালে দাঁড়ায়—

প্রথমত : তিনি ছোটগল্প রচনা বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু উপন্যাস রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় : গল্পের প্রকৃতি নিয়ে এতোটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে তা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে বিতর্কে যোগ দিয়েছেন।

তৃতীয় : উপন্যাস রচনার একটি ধারা রয়েছে। সেটিকে ছুঁতে পারেনি তাঁর উপন্যাস। এটিকে উপন্যাস হিসেবে ব্যাখ্যা না করে 'প্রবন্ধ' হিসেবে দেখার কথা লেখকক জানিয়েছেন।

চতুর্থত : নিজের উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাস ছিল। তিনি প্রকাশক সম্পাদক বা অন্য কারও পরামর্শে তাঁর রচনার আকারও প্রকৃতি পরিবর্তন করতে বাধ্য নন।

অভিমতগুলোর বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, যেকোন সকল উপন্যাস রচয়িতা (ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে) প্রথমে ছোটগল্প লিখে তাঁর শিল্প কুশলতা বৃদ্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই ধারার ঔপন্যাসিক। তিনি তাঁর 'চোখের বালি' উপন্যাসের 'সূচনা' অংশে এবিষয়ে লিখেছিলেন—

''...সেদিনের আসর ভেঙ্গে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে। সহ-সম্পাদক শৈলেশের বিশ্বাস ছিল, আমি এই মাসিকের বর্ষব্যাপী ভোজে গল্পের পুরো পরিমাণ জোগান দিতে পারি। অতএব কোমর বাঁধতে হবে আমাকে। এ যেন মাসিকের দেওয়ানি আইন অনুসারে সম্পাদকের কাছ থেকে উপযুক্ত খোর-পোশের দাবি করা। বস্তুত ফরমাশ এসেছিল বাইরে থেকে। এর পূর্বে মহাকায় গল্প সৃষ্টিতে হাত দিই নি। ছোটো গল্পের উল্কা বৃষ্টি করেছি।''[৬]

জগদীশবাবুও কোমর বেঁধে নেমেছিলেন। এবং চিঠিটি লেখার মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তাঁর

প্রথম উপন্যাস 'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯) প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি পাঠ করেই রসজ্ঞ পাঠক বুঝতে পারেন লেখক ছোটোগল্পের উল্কাবৃষ্টি করার পাশাপাশি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন উপন্যাস রচনার। এবং উপন্যাস হিসেবে এটির সাফল্য প্রশ্নাতীত। প্রসঙ্গত কয়েকজন প্রথিতযথা সমালোচকের অভিমত গ্রহণ করা যেতে পারে—

■ ''... ব্যক্তি, কাহিনীর বুনট, জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখার ক্ষমতা এবং চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ পরিস্ফুট করার প্রবণতায় এটিকে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের সম্মান দেওয়াও আমার মতে অযৌক্তিক নয়।''[৭]

■ ''অসাধু সিদ্ধার্থ জগদীশ গুপ্তের সবচেয়ে পরিচিত ও বহু পঠিত উপন্যাস; আর এই উপন্যাসটি দিয়েই শুরু হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন যুগের।''[৮]

■ ''প্রথাসিদ্ধ উপন্যাস শৈলীর বিচারে তাঁর উপন্যাসগুলির বিচ্যুতি রয়েছে। কিন্তু যে স্বতন্ত্র জীবনবোধের দ্বারা তিনি এই প্রবহমান জীবনযাত্রাকে বুঝবার এবং ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন, সে উপলব্ধির মাধ্যম হিসাবে এরকম উপন্যাস শৈলীর ব্যবহার সার্থক। ... লঘুগুরু, রতি ও বিরতি, অসাধু সিদ্ধার্থ, গতিহারা জাহ্নবী, নন্দ আর কৃষ্ণা, সুতিনী, মহিষী, তাতল সৈকতে প্রভৃতি উপন্যাস এই শ্রেণীতে পড়ে।''[৯]

অভিমতগুলি থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, জগদীশবাবু একেবারে প্রথম উপন্যাসেই নিজেকে সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। লেখক যে নিজেকে ধীরে ধীরে তৈরী করেছেন, তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের গ্রাফ প্রতিদিন একটু একটু করে বেড়েছে, এটা সম্পাদকের সঙ্গে নিজের গল্পের প্রকৃতি নির্ণয় নিয়ে যে ঠাণ্ডা লড়াই তা থেকেই অনায়াসেই আমরা বুঝতে পারি। এবং এই আত্মপ্রত্যয় তাঁকে গতানুগতিক উপন্যাসের Form ভেঙ্গে নতুনভাবে গল্প বলার ক্ষেত্রে প্রেরণা জুগিয়েছে। আসলে ততদিনে পুরনো ছক ভেঙে নতুন ভাবে গল্প বলার প্রবণতা লেখককে ঘিরে ধরেছে। এবং একজন সৃষ্টিশীল লেখকের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। পুরনো পথ ছেড়ে 'নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে।' সেজন্যে গল্প বলার আগেই এর 'প্লট' সম্পর্কে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দিলেন লেখক। ইদানিং কালে যে 'অ্যান্টি নভেলের' কথা বলা হয় জগদীশবাবুর উপন্যাসকে 'প্রবন্ধ' হিসেবে বিচার করার

বার্তায় তারই আভাস পাওয়া যায়। পরিণত বয়সে পৌঁছে তিনি ফরমাশী লেখার গণ্ডী যে ভাঙবেন এটাই তো স্বাভাবিক। যদিও কোনও কোনও সমালোচক এই দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

''জগদীশবাবু গল্প গড়তে জানতেন না। পুরনো রীতির অনুসরণ করলেও তার আকর্ষণী শক্তিকে কাজে লাগাতে পারেননি হয়ত চানও নি। না চাইলে সাহিত্যের অভিপ্রায় বিষয়ে তাঁর ভাবনায় গলদ ছিল। তবে পারেননি, এটাও ভুল নয়। 'মোর অধিকার সুন্দরের নাহি নাহি... কোথা পাব পুষ্পাসব ধুতুরা গেলাস ভরিয়া করেছি পান নয়ন নির্যাস।' এই যাঁর বোধ এবং তার সঙ্গে এক ধরণের একগুঁয়ে আন্তরিকতা যা কোনোরূপ আপোসে রাজি ছিল না। এতে তাঁর উপন্যাসের শিল্প মানের ক্ষতি হয়েছে।''[১০]

ড. গুপ্তের এই সমালোচনায় নিন্দা এবং প্রশংসা দুই-ই আছে। তবে একথা সত্যি জগদীশবাবু লিখে গেছেন আপন খেয়ালে। যশ-খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার কথা তিনি কখনো ভেবেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর জীবন অভিজ্ঞতাই তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। ইচ্ছা পুরণের গল্প তিনি লিখতে পারেননি। এটাই তাঁর সবচয়ে বড় দুর্বলতা। উপন্যাস তথা কথাসাহিত্যের আঙ্গিকগত বিচারের আরেকটি দিক হল এতে প্লট না চরিত্র—কোন্‌টির গুরুত্ব থাকবে। কেউ বলেছেন প্লটের কথা, আবার কেউ চরিত্রের কথা। জগদীশবাবুর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বলেছিলেন তাঁকে কোনদিন প্লট নিয়ে ভাবতে হয়নি; তিনি একটি চরিত্রকে নিয়ে কাহিনী বলতে শুরু করতেন এবং পরে প্লট একাকী দাঁড়িয়ে যেত। অ্যারিস্টটল তাঁর ' পোয়েটিক্‌স্' গ্রন্থে ট্রাজেডির আলোচনায় আবার প্লটকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জগদীশবাবু তাঁর 'রোমন্থন' উপন্যাসের ভূমিকায় স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন সেখানে প্লট নেই। কতগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা একস্থানে গিয়ে ফলপ্রসব করছে। অর্থাৎ সেখানে ঘটনাগুলির কোলাজই কাহিনীতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। আবার একটি চিঠিতে তিনি 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুকে লিখেছেন—

''কথাসাহিত্যে কথাকে প্রাধান্য না দিয়া, শুধু তাহাকে চরিত্র ফুটাইবার অবলম্বন রূপে ব্যবহার করিলে সে ক্ষুন্ন হয়, অর্থাৎ কথা আর কথা থাকে না, বক্তৃতায় দাঁড়াইয়া যায়।''[১১]

এই চিঠির বক্তব্য থেকে পরিস্কার যে, তিনি চরিত্র পরিস্ফুটনকেই কথার সাহিত্যের প্রধান

লক্ষণ বলে বিবেচনা করতেন না। আবার 'বক্তৃতা' যে 'কথা' নয় সেটাও তিনি বলেছেন। তবে 'কথা' শব্দটির দ্বারা তিনি কী বুঝিয়েছিলেন। এবিষয়ে উত্তর সন্ধানের প্রয়াস করেছেন সমালোচক ড. সুমিতা চক্রবর্তী। তিনি প্রসঙ্গত লিখেছেন—

'' 'কথা' বলতে কী বুঝিয়েছিলেন তিনি? নিশ্চিতভাবেই 'শব্দ' বা 'words' কিংবা 'বাক্য' বা 'sentence' বোঝান নি। 'কথাসরিৎসাগর'-এর দেশ ভারতবর্ষের লেখক হলেও জগদীশ গুপ্ত সম্ভবত 'গল্প' বা 'story' অর্থে 'কথা' শব্দটির প্রয়োগ করেন নি। যদিও আজও হিন্দী ভাষায় 'কথা' শব্দটির অর্থ গল্পই। পূর্ব বাংলার 'পরণ-কথা', এই বাংলার 'রূপকথা', 'উপকথা' ইত্যাদি শব্দ বন্ধেও লেগে আছে পুরনো অর্থটির রেশ। আধুনিক বাংলার 'কথাসাহিত্য' শব্দটিতেও সেই অর্থেরই প্রচ্ছা। ... তাঁর পত্রোল্লিখিত 'কথা' শব্দটির নিহিত অর্থ ব্যঞ্জনা হল মানব প্রকৃতি সম্পর্কে শিল্পীর স্বকীয় উপলব্ধিজাত জীবন ভাষ্য।"[১২]

এখানেই লেখকের বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবে উপন্যাসের সঙ্গে 'story'-র সম্পর্ক উপন্যাস রচনার একেবারে সূচনা লগ্ন থেকেই। সে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য সাহিত্য যাই হোক না কেন। যেমন পাশ্চাত্য তাত্ত্বিক ই. এম. ফর্স্টার খুব স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছেন—

"We shall al agree that the fundamental aspect of the novel is its story telling aspect, but we shall voice our assent in different tones, and it is on the precise tone of voice we employ now that our subsequent conclusions will depend."[১৩]

এই অভিমত থেকে স্পষ্ট যে উপন্যাসে 'story-telling' থাকতেই হবে। এদেশে বঙ্কিমচন্দ্রও উপন্যাস কথাটির অর্থ করতে গিয়ে 'রচা কথা'র উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যেও 'গল্প নির্ভর' কাহিনী বর্ণনার ধারা লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের সমাজ ভাবনা থেকে শুরু করে মানবচরিত্র বিশ্লেষণ—সবক্ষেত্রেই তাঁরা উপন্যাসে এই 'গল্প' বলার চেষ্টা করেছেন। এমনকি উপন্যাসের আধারে তত্ত্বকথা বলতে গিয়েও তাঁরা তাঁদের এই অবস্থান থেকে সরে আসেননি। প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের আলোকে লেখা 'আনন্দমঠ-দেবী চৌধুরাণী-সীতারাম'-উপন্যাস ত্রয়ী, রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' এবং শরৎচন্দ্রের 'শেষ-প্রশ্নের' মতো উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁদেরই উত্তরসূরী জগদীশ

গুপ্তও উপন্যাসে মানব জীবনের বিচিত্র দিক, বিশেষ করে আচরণের আড়ালের যে কুটিল মানুষ, তাদের অন্তর্গত খলতা-ক্রুরতা-নিষ্ঠুরতা-কামুকতা-পাপাচার ইত্যাদিকে তুলে আনতে গিয়ে নিজের মতো করে একটা শিল্পীত জীবন ভাষ্য রচনা করেছেন। তবে তিনি নিছক কাহিনীর জন্যে কাহিনী নির্ভর 'প্লট' রচনা করেন নি। এক্ষেত্রেও তাঁর স্বকিয়তা লক্ষ্য করেছেন ড. সুমিতা চক্রবর্তী। তিনি লিখেছেন—

''একান্ত কাহিনি-নির্ভর কোনো প্লট নির্মাণের ইচ্ছে তাঁর যেমন ছিল না তেমনি বিশেষভাবে কাহিনি আধার যে তিনি ভাঙতেই চেয়েছিলেন- তাও নয়। এজন্যই কখনো তাঁর হাতে গড়ে উঠেছে কার্যকারণ শৃঙ্খলা পরম্পরা অস্বীকার করা আপাত শিথিল জীবন চিত্র—যেমন দেখেছি লঘুগুরু উপন্যাসে।''[১৪]

ড. চক্রবর্তী 'লঘুগুরু'র প্লটকে শিথিল বলেছেন। তবে গণিকার জীবন বৃত্তের নিরীখে যদি উপন্যাসটিকে বিচার করা যায় তাহলে কিন্তু একটা পরম্পরা আমরা লক্ষ্য করি। গণিকা নারী উত্তম বহু পুরুষ চারিণী হলেও তার অন্তরে একটি সুপ্ত গৃহী নারী সত্তা ছিল। যদিও কেউ কেউ উত্তমের পূর্ব জীবনের ইতিহাসকে উল্লেখ না করার জন্য সমালোচনা করেছিলেন। এই দলে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'পরিচয়' পত্রিকায় 'পুস্তক পরিচয়'-এ এবিষয়ে তিনি স্পষ্টতই অভিযোগের ভঙ্গীতে লিখেছিলেন—

''...এককালে উত্তমের সমাজ বিশ্বম্ভরের সমাজের চেয়ে শিক্ষায়, আচরণে উপরের স্তরের ছিল। সেটাও লেখকের জবানবন্দীর উপর বিশ্বাস করে ধরে নিতে হয়। উত্তমের এই দিককার ছবিটা একেবারে বাদ দিয়েই শুরু করা হয়েছে। উত্তম যদি সাধারণ বেশ্যার মতোই হত, তাহলে পাঠকের কল্পনার উপরে বরাৎ দিয়ে ইতিহাস অসম্পূর্ণ রাখলে কোনো অসুবিধা ঘটত না।''[১৫] রবীন্দ্রনাথ কথিত এই সমালোচনায় 'সাধারণ বেশ্যার মতো হত' —এই কথাটিতে অসঙ্গতি রয়েছে। বেশ্যার সাধারণ বা অসাধারণ বলতে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখকের সমাজজীবন অভিজ্ঞতার উপরেও ব্যঙ্গবাণ মেরেছিলেন। তাঁর পরিচিত জগতে এমন ঘটনা সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেছিলেন। লেখক নিশ্চয়ই 'অনতি পরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও

জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন' বলে মন্তব্য করেছিলেন। এইভাবে রচনাকে ছেড়ে লেখককে আক্রমণ করাটা আসামীকে ছেড়ে তার জনককে আক্রমণ বলে মন্তব্য করেছিলেন জগদীশবাবু। সেইসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন—

''লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল আমাকে কাটাইতে হইয়াছে যেখানে 'স্বভাব সিদ্ধ ইতর' এবং 'কোমর বাঁধা শয়তান' নিশ্চয়ই আছে; এবং বোলপুরের টাউন প্ল্যানিং-এর দোষে যাতায়াতের সময় উঁকি মারিতে হয় নাই, 'ও জায়গা' আপনি চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি আমার আপত্তি এই যে, পুস্তকের পরিচয় দিতে বসিয়া লেখকের জীবনকথা না তুলিলেই ভাল হইত, কারণ উহা সমালোচকের 'অবশ্য দায়িত্বের বাইরে' এবং তাহার 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' ছিল না।''[১৬]

এরকম 'ঠাণ্ডা লড়াই'য়ের ইতিবাচক পরিণতি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে। তিনি এই সমালোচনার শুরুতেই মেনে নিয়েছিলেন, লেখকের অর্থাৎ জগদীশবাবুর লেখার ক্ষমতা আছে। এর পরিচয় রবীন্দ্রনাথ আগেও পেয়েছেন এবং এই উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দেখতে পাচ্ছেন।

ড. সুমিতা চক্রবর্তীর বক্তব্যে ফিরে যাই। তিনি 'লঘুগুরু'র কাহিনীকে 'আপাত শিথিল জীবন চিত্র' বলেছেন। যদি গণিকা নারীর পরম্পরার দিক থেকে দেখা যায় তাহলে বলব, উত্তম থেকে টুকী মাঝে সুন্দরী—গণিকা নারীর এক ধারাবাহিক এবং পূর্ণবৃত্ত জীবনচিত্র অংকন করেছেন লেখক। এবং এই বৃত্তাঙ্কনে লেখকের মানব প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট উপলব্ধি জাত জীবনভাষ্য প্রকাশ পেয়েছে। তা হল 'স্বভাব সিদ্ধ ইতর' বিশ্বম্ভর আর 'কোমর বাঁধা' শয়তান পরিতোষের মত পুরুষরা নারীদের কখনোই ভোগ্যবস্তুর উর্ধ্বে স্থান দেয়নি। সমাজ তার নিজের প্রয়োজনেই গৃহী নারীকে গণিকা বানায়। তাদের পরিচয় সমাজের অন্ধকার দিকটিতেই হারিয়ে যায় বারবার। তাই যূথী থেকে বনমালা আর বনমালা থেকে উত্তম হয়েছে এবং উত্তমেরই করুণ পরিণতি টুকীর পাপের পথে নেমে যাওয়া। ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে উত্তমের গৃহী নারীসত্তার বিসর্জন হয়ে গেছে বিশ্বম্ভর পরিতোষ আর অচিন্ত্যদের মতো পুরুষের জৈবিক ক্ষুধা মেটাবার প্রয়োজনে। এভাবে দেখলে কিন্তু একটা পরম্পরাগত যোগসূত্র

খুঁজে পাওয়া যায়। তবে 'লঘুগুরু' সম্পর্কে ড. চক্রবর্তী শৈথিল্যের প্রশ্ন তুললেও 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনিবার্য ঘটনামালার গাঢ় বিন্যাসে জমাট প্রায় গোয়েন্দা গল্পের প্লট রয়েছে। অথচ দুটি উপন্যাসই লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে বলে ড. চক্রবর্তী অভিমত প্রকাশ করেছেন। এইভাবে লেখকের স্বতন্ত্র সন্ধান ও আঙ্গিকের মূল্যায়ন করে ড. চক্রবর্তী লিখেছেন—

''বাস্তব মানুষের অনুরূপ 'জীবন্ত' চরিত্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা থেকে তাঁর চরিত্রায়ণ নয়, আবার চরিত্রটিকে বিশেষভাবে অদ্ভুত বা রহস্যময় করে তুলতেও চান নি তিনি। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মনোবিশ্লেষণে তিনি অত্যন্ত সফল কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা অন্তর্মুখ ধরণের নয়।"[১৭]

জগদীশবাবুর উপন্যাসের চরিত্রেরা আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক যাদের অন্তর্গত দারিদ্রজনিত যাবতীয় লক্ষণগুলো লেখক সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, এমন স্বীকৃতি দিয়ে ড. চক্রবর্তী তাঁর আলোচনার অন্য একটি অংশে জানিয়েছেন—

'' 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' হয় একথা মানুষ চিরকালই জানে। বঙ্কিমচন্দ্র মন্বন্তর-নির্জিত গ্রামবাসীর লুঠেরায় পরিণত হওয়া অনেকবার দেখিয়েছেন। 'আনন্দমঠ' এর সেই অংশটি ভোলা শক্ত যেখানে দীর্ঘ অনাহারী মানুষগুলি শিশু শরীর আগুনে ঝলসে খাবার কল্পনায় লোলুপ হয়ে ওঠে। কিন্তু বঙ্কিম এই বিষয়টিকে সবিস্তার বিশ্লেষণের গুরুত্ব দিয়ে উপন্যাস রচনা করেন নি। একাজটা বোধহয় বাংলা সাহিত্যে প্রথম করেছেন জগদীশ গুপ্তই। যদিও সব রচনায় নয়।"[১৮]

এভাবেই একজন মননশীল পাঠক ও সমালোচকের পুনঃপ জগদীশ গুপ্তের মৌলিকত্বের প্রমাণ হয়ে গেছে। যদিও সমালোচক 'বোধহয়' শব্দটি দ্বারা সংশয় যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি লেখকের সব রচনাকে এর অন্তর্ভুক্ত করেননি।

ড. ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর মননশীল আলোচনায় বাংলা উপন্যাসকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—

- ঘটনামূলক, নাট্যরীতি-ভিত্তিক কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র রচনা।
- প্রাত্যহিক বিবরণধর্মী নিস্তরঙ্গ কাহিনী—জীবন ও মন। মনের সবটাই উপরতলার

প্রত্যক্ষতা।

■ অন্তশ্চেতনায় ডুব দিয়ে মনের লুকনো জটের খোঁজ ও বিশ্লেষণ।

এই শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে জগদীশগুপ্তের উপন্যাসগুলোর অবস্থান নির্ণয় করে লিখেছেন—

''... জগদীশবাবু এই তৃতীয় মডেলের লেখক। যে কোনো মডেলেই উঁচু মানের লেখক আসতে পারেন। তবে এই তৃতীয় রীতিটি মিশ্র আকারে প্রকাশ পেলেও বাংলা উপন্যাসে একান্ত হয়ে ওঠেনি আগে, নরেশবাবুর কিছু লেখা বাদ দিয়ে। সেদিক থেকে জগদীশবাবুর বিশেষ স্থান আছে বাংলা নভেলের ইতিহাসে।''[১৯]

এখানেও জগদীশবাবুর মৌলিকত্বের স্বীকৃতি রয়েছে। যদিও ড. গুপ্ত লেখকের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করেছেন। এরূপ সমালোচনা করেও অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সেই অন্ধকারের ভিতরেও ক্ষণপ্রভার আভাস পেয়েছিলেন। এবং তার নিরীখে জগদীশবাবুর শিল্প সৃষ্টির প্রশংসাই করেছেন—

''জীবনের অন্তর্নিহিত শুদ্ধিভবনের শক্তিকে দুঃখবাদী জগদীশবাবু সর্বত্রই পরাভূত দেখেছেন। একটা শিল্পী জীবনের আদি অন্তে জীবনবোধের অপরিবর্তনীয়তা শিল্প এবং জীবন দুয়ের ন্যায়েই অসত্য। জগদীশ গুপ্তের দৃষ্টির এই অপরিবর্তনীয়তা অবশ্যই আমাদের পীড়া দেয়। কিন্তু তিনি কখনো জীবনের প্রচেষ্টাকে ছোট করে দেখেননি। শুদ্ধিভবনের জন্য জীবনের অমেয় প্রয়াসকে তিনি যদি ছোট করে দেখতেন তাহলে তাঁর পক্ষে শিল্প সৃষ্টিই সম্ভব হত না।''[২০]

আবার উপন্যাসের কাহিনীতে নাট্যকারের নির্লিপ্তি ছিল জগদীশবাবুর আদর্শ। সেজন্য তিনি উপন্যাসে যারপরনাই স্বল্পভাষী। ব্যক্তিগত জীবনেও এই স্বল্পভাষিতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মাতৃবিয়োগ সম্পর্কে মুরলীধর বসুকে নানা কাজের কথার ফাঁকে লিখেছিলেন—

''মা স্বর্গারোহন করিয়াছেন।''[২১]

কোনোরকম দীর্ঘ ভূমিকা উপসংহার ছাড়া মায়ের মৃত্যু সংবাদ দিয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর বিভিন্ন রচনাতেও আমরা লক্ষ্য করি। দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়—

■ ''অক্ষয় মরবে এবং রতি মঞ্জরী বিধবা হবে।''[২২]

■ 'দিবসের শেষে' গল্পে পাঁচুর মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনায় লিখেছেন—

''সূর্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।''[২৩]

■ 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের শেষে যখন ছদ্মবেশী নটবরের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে নকল সিদ্ধার্থকে ভালোবেসে অজয়া যেভাবে প্রতারিত হয়েছিল সেই যন্ত্রণা প্রকাশ করে অজয়া শুধু একটি বাক্যব্যয় করেছে। রজতকে সে বলেছে—

''দাদা, ওঁকে যেতে বলো।''[২৪]

■ 'যথাক্রমে' উপন্যাসের বামপ্রসাদের স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনাতেও লেখক একটি বাক্যব্যয় করেছেন—

''মৃদু স্রোতের মাঝে যমদণ্ড পড়িয়া স্রোত বাধা পাইয়া একদিন ফেনাইয়া উঠিল, স্ত্রীর মৃত্যু রামপ্রসাদের অন্তরে কঠিন ঘা দিল।''[২৫]

■ 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শরৎ-এর স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—

''শরৎ বিধবা হইল।''[২৬]

■ 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসে নারীঘটিত অপরাধের ফলে জেল প্রত্যাগত সাতকড়িকে বাড়ীর সকলেই সাদরে গ্রহণ করেছে। কিন্তু স্ত্রী মাখন লম্পট স্বামীকে গ্রহণ করতে না পারলে শাশুড়ি সমাজপতির ভূমিকা নিয়ে মাখনকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। সেই শাস্তিদৃশ্য বর্ণনা করে লেখক জানিয়েছেন—

''... ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতেই তাহাকে বারান্দায় আনিলেন উঠানে নামাইলেন, উঠান পার করিলেন... বধূর ঘাড় হইতে হাত নামাইয়া সদর দরজার খিল খুলিলেন...''[২৭]

এরকম অজস্র স্পল্পবাক্ বর্ণনা বিভিন্ন রচনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই স্বল্পভাষিতা বহুক্ষেত্রেই শিল্প রসোত্তীর্ণ হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখক আরেকটু অমিতব্যয়ী হলে পাঠকের পক্ষে ভালো হত। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত 'লঘুগুরু' উপন্যাসটির ক্ষেত্রে মিতভাষিতার সমালোচনাকে অতিক্রম করেছেন। তিনি

স্পষ্টতই জানিয়েছেন, লেখকের এই স্বল্পভাষিতা কখনো কখনো তাঁকে ত্রুটির সীমায় উপনীত করেছে। কিন্তু যেসমস্ত ক্ষেত্রে লেখক সফল হয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম 'লঘুগুরু'র উত্তম চরিত্র। প্রসঙ্গত অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাটির প্রশংসা করে লিখিছেন—

''...টুকীর অন্ধকারে অন্তনের ভেতরে যেন প্রতিফলিত হল উত্তমের সাধনার অন্ধকারে বিলুপ্তি—যে সাধনা একমাত্র টুকি ছাড়া লালমোহন, বিশ্বম্ভর, পাড়া প্রতিবেশী, বিশ্বম্ভরের বন্ধুবান্ধব সকলের কাজ থেকে আঘাত পেয়েছে। কাম্য বিষয়ের স্পষ্টতায় এবং স্পষ্ট কামনার সঙ্গে প্রাক্তনের কর্মফলের সংঘাতে ব্যক্তির চূর্ণীকৃত রূপ রচনায় 'লঘুগুরু' অনুপম। 'লঘুগুরু' তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাস হলেও সার্থকতায় বোধ করি জগদীশগুপ্তের সর্বোত্তম রচনা।''[২৮]

বস্তুত জগদীশবাবু যে অত্যন্ত সচেতনভাবেই তাঁর উপন্যাসের প্লট বিষয়ে নিজস্ব ভাবনা প্রকাশ করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিভিন্ন সমালোচকের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা সেকথারই সমর্থন দেয়। যাঁরা মনে করেন জগদীশবাবু উপন্যাসের প্লট রচনার ব্যাপারে অমনোযোগী ছিলেন তাঁরা ঠিক বলেন না। বরং এবিষয়ে তিনি অতিরিক্ত সচেতন ছিলেন। 'রোমন্থন' উপন্যাসের ভূমিকা ছাড়াও 'দুলালের দোলা' এবং 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের নিবেদন অংশে নিজের অভিমত স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন।

■ 'দুলালের দোলা' উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন— ''ইহাতে 'প্লট্' নাই আমার বক্তব্য ব্যক্ত করয়িাছি মাত্র; গল্প তৈরী আমার উদ্দেশ্য নয়। উপন্যাস সুলভ গল্পের বস্তু সংস্থান বা পরিপুষ্টি ইহাতে নাই।''[২৯]

■ 'রোমন্থন' উপন্যাসের ভূমিকায় বলা কথারই পুনরাবৃত্তিমাত্র এটি। আসলে নিজের রচনা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই তিনি এই পুনরুক্তি করেছেন। প্রায় সমান্তরাল বক্তব্য আমরা পাই তাঁর 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের নিবেদন অংশেও। সেখানে তিনি তাঁর বক্তব্যকে আরও অকপটে ব্যক্ত করেছেন—

''এই গল্পটির রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। গল্পটিকে ঘটনাবহুল এবং দ্রুত গতিশীল করিয়াছি। পাত্র হইতে পাত্রান্তর অবলম্বন করিয়া কথা অগ্রসর হইয়াছে গতি পুনঃ পুনঃ পথচ্যুত হওয়ায় গল্পের অখণ্ডতা ভগ্ন হইয়াছে মনে হইতে পারে; সমাপ্তির

পূর্বে একটা সমগ্র মূর্তির আভাস পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না; তথাপি যে পাঠক রসতৃষ্ণা লইয়া যাত্রা করিবেন তাহাকে পথিমধ্যে বা প্রান্তে পৌঁছাইয়া নিরাশ হইতে হইবে না।

'বক্তব্য সংক্ষেপে বলো'—কথকের প্রতি মানুষের এই হুকুম চিরকাল আছে। রূপকে বিকল এবং রসপুঞ্জকে পঞ্চতিক্তে পরিণত না করিয়া সেদিক হইতে পাঠককে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি।"[৩০]

যথেষ্ট সচেতন একজন শিল্পীর পক্ষে এভাবে নিজের রচনার প্রকৃতি সম্পর্কে পাঠককে পূর্ব থেকে অবহিত করা সম্ভব ছিল। এবং তিনি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সফল একজন শিল্পী ছিলেন। তাঁর এই দিকটির স্বতন্ত্রতা স্বীকার করে সমালোচক ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

''সাহিত্যে জীবনের কোনো নিটোল কাহিনী জগদীশগুপ্ত দেখান নি, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন জীবনের কোনো পরিপাটি ছক নেই। মানুষ অনেক পরিকল্পনা করে জীবনটাকে একটা কিছু বানিয়ে তুলতে চায়, কিন্তু মানুষের সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে ধুলিসাৎ করবার জন্য এক নির্মম অ-দৃষ্ট শক্তি উন্মুখ হয়ে আছে, যার ফলে মানুষের কোনো উদ্যোগই শেষপর্যন্ত সফল হয় না। সুতরাং সাহিত্যে কৃত্রিমভাবে একটি নিটোল জীবনবৃত্ত আঁকা অর্থহীন বলে তাঁর কাছে মনে হয়।"[৩১]

এখানেই জগদীশবাবু সকলের চেয়ে আলাদা। এটাই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

উপন্যাসের চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার লিখেছেন—

''উপন্যাসের চরিত্র মাত্রেরই দুটি মাত্রা আছে। একদিকে সে বাইরের জীবনের প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে সে অন্তর্জীবনের আলোড়নে আলোড়িত। এই দ্বিমাত্রিক গতিবিধি নিয়েই তার তথাকথিত 'চরিত্র' নামটি সার্থক। এই সূত্রেই 'সাহিত্যিক চরিত্র' 'বাস্তব চরিত্র' থেকে আলাদা হয়ে গেছে।"[৩২]

জগদীশগুপ্তের উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই লেখকের জীবনক্ষেত্র থেকে তুলে আনা। মূলত গ্রামীণ পরিবেশ আর আদালতে কর্মসূত্রে চোখে দেখা ইতর বিশেষ মানুষগুলিকে তিনি নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য, জাত-পাত-বর্ণ-বিদ্বেষ, কামতাড়িত স্থূল রুচির মানুষগুলোকে তিনি একেবারে নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন। সাধারণতঃ যাদের প্রতিদিন

দেখা যায় পথে ঘাটে, গ্রামে, সমাজে-সংসারে। অসুস্থ বিকারগ্রস্ত, দারিদ্র্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাওয়া মানুষগুলো তাদের নিজ নিজ স্বরূপ নিয়ে উঠে এসেছে। ড. সুমিতা চক্রবর্তী এইসব চরিত্রের সম্পর্কে বলেছেন—

''...তাঁর আকর্ষণ সেই জাতীয় চরিত্রের প্রতিই যারা আমাদের মধ্যেই নিতান্ত স্বাভাবিকতার এক পরিচয় নিয়ে বাস করে কিন্তু যাদের মনের গঠনে অসদ্‌বৃত্তি সমূহের প্রাধান্য। সহজ বাংলায় আমরা যাদের বলি 'পাজি'। 'লঘুগুরু'র বিশ্বম্ভর ও পরিতোষ 'অসাধু সিদ্ধার্থ'র সিদ্ধার্থ বা নটবর, 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' উপন্যাসের দয়ানন্দ 'গতিহারা জাহ্নবীর'র অকিঞ্চন—এরকম সহজ অসৎ ব্যক্তিরাই তাঁর অবলম্বন।''[৩৩]

সভ্যতার স্বাভাবিক নিয়মে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পথ ধরে যেমন সবল-দুর্বল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে মেরুরেখা গড়ে উঠেছে তেমনি প্রকৃত শিক্ষার অভাবে কদর্য অশ্লীল রুচির মানুষেরাও সমাজের চারপাশে ভিড় করে শিক্ষিত রুচিশীল মানুষের সমান্তরালভাবে। জগদীশগুপ্ত প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ অন্যায়-অত্যাচার-বৈনাশিকতায় যুক্ত মানুষদেরই বেশী করে তুলে এনেছেন তাঁর রচনায়। বিশেষতঃ গ্রাম জীবন নির্ভর উপন্যাসগুলিতে এদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এইসব মানুষদের চিহ্নিত করছে 'দুলালের দোলা' উপন্যাসের পিরু চরিত্রটি) —যার কথার মধ্যদিয়ে আসলে লেখকেরই অন্তরস্থ ভাবনাগুলি প্রকাশ পেয়েছে। নীরদবরণকে উদ্দেশ্য করে পিরু উপন্যাসের একজায়গায় বলেছে—

''দু'রকমের লোক দেখবেন এ গাঁয়ে আর তারা হদ্দ বেহায়া আর কারুর উপর তাদের দরদ নাই।... একদল তারা আছে—জন্মে ইস্তক খেতে পায় না, তারা বেহায়া হয়ে উঠেছে—লজ্‌জা তাদের নাই। আর একদল আছে তারা সুদখোর, টাকার ময়লা চেটে চেটে খায় এদেরও চক্ষু লজ্জা নাই, কাণ্ডজ্ঞান নাই।''[৩৪]

এই উভয় শ্রেণীর মানুষেরাই জগদীশবাবুর গল্প উপন্যাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিশেষ করে ইতর শ্রেণীর মানুষেরা। যাদের সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ ভিন্ন একটি পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন—

''...জীবনের ইতর শ্রেণীর

মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া জুতো পায়ে

বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে;
সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে
এইসব প্রাণকণা জেগেছিলো—বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে
সহসা সুন্দর ব'লে মনে হয়েছিলো কোনো উজ্জ্বল চোখের
মনীষী লোকের কাছে এইসব অণুর মতন
উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে।"[৩৫]

পুরু পাওয়ারের চশমার ফাঁক দিয়ে 'উজ্জ্বল মনীষী' জগদীশ গুপ্ত এইসব অণুর মত জীবনগুলোকে দেখেছিলেন। হোক না তারা ইতর, হোক অশিক্ষায়-দারিদ্র্যে-পরশ্রীকাতরতায় হিংসায়-কামুকতায় জর্জরিত মানুষ। তবু এরাই তো বাংলাদেশের গ্রামজীবনের প্রতিনিধি। অত্যন্ত নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে লেখক এদের তুলে এনেছেন। 'মহিষী' উপন্যাসের ব্রজকিশোর অশোক-জ্যোর্তিময়ী, 'লঘুগুরু'র 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' বিশ্বম্ভর আর 'কোমর বাঁধা শয়তান' পরিতোষ ছাড়াও উত্তম-টুকী-সুন্দরী-বঙ্কু-অচিন্ত্য, 'রোমন্থনে'র অভয় ও কালোশশী, 'দুলালের দোলা'র পিরু-সতীশ-পিসিমা 'যথাক্রমে' উপন্যাসের রামপ্রসাদ-দীনবন্ধু-সাবিত্রী কিংবা ফণীডাক্তার মতিলাল-নিত্যপদ, 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের শরৎ-মনোহর দত্ত-সুখী 'সুতিনী'র দুর্গাপদ রাজবালা-মধুবালা; 'রতি ও বিরতি'র রাম-লব-গয়ামণি 'গতিহারা' 'জাহ্নবী'র অকিঞ্চন-কিশোরী, 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' উপন্যাসের দয়ানন্দ ও মল্লিকা; নন্দ আর কৃষ্ণা উপন্যাসের নন্দ-মণীন্দ্র-মমতা-কৃষ্ণা; 'নিষেধের পটভূমিকায়' উপন্যাসের অভয়া-অতুল-শান্তি-বসন্ত; কিংবা 'কলঙ্কিত তীর্থ -এর মাখন-সাতকড়ি প্রভৃতি চরিত্র একেবারে লেখকের চোখে দেখা জীবন থেকে তুলে আনা রক্তমাংসের মানুষ। এদের তুলে আনবার জন্যে লেখককে 'অনতিপরিচিতের গণ্ডী ছাড়িয়ে কাঁটাবন পেরিয়ে' যেতে হয়নি। তাঁর চেনাবৃত্তের মধ্যেই এরা তাদের জান্তব চাওয়া-পাওয়া নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। আবার তাঁর উপন্যাসে দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে পুরুষ চরিত্রদের তুলনায় নারী চরিত্ররাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবচেয়ে বেশী। এপ্রসঙ্গে ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় যথার্থই অভিমত প্রকাশ করে লিখেছেন—

''হয়তো পুরুষ চরিত্র অঙ্কনে অধিকতর দক্ষতাই জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে বেশি প্রত্যাশিত ছিল, কারণ তিনি লেখেন প্রধানত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে নির্ভর করে এবং সেই অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে পুরুষের প্রবেশ সহজতর অথচ যেমন তাঁর ছোটগল্পে, এখানেও (উপন্যাসে) আমরা দেখি পুরুষ চরিত্রের তুলনায় মহিলা চরিত্রগুলি অনেক বিচিত্র এবং তীব্র। অন্তত জগদীশ গুপ্তের একজন ভক্ত পাঠক তাঁর উপন্যাস জগতের নারীগুলিকে যেভাবে মনে রাখবেন, পুরুষগুলিতে সেভাবে নয়।''[৩৬]

ড. চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করি। 'অসাধু সিদ্ধার্থে'র নটবর ওরফে সিদ্ধার্থকে বাদ দিলে প্রায় সব উপন্যাসেই পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারীরাই সংবেদনশীল পাঠকের অন্তরকে নাড়া দিয়ে গেছে। 'লঘুগুরু' উপন্যাসের উত্তম ও টুকী এমন কী সুন্দরী 'মহিষী' উপন্যাসের জোতির্ময়ী, 'সুতিনী' উপন্যাসের রাজবালা 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের শরৎ 'গতিহারা জাহ্নবী'র কিশোরী, 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা'র মল্লিকা, 'নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসের কৃষ্ণা, 'নিষেধের পটভূমিকা'য় উপন্যাসের অভয়া ও শান্তি, 'কলঙ্কিত তীর্থ'র মাখন প্রমুখ নারী চরিত্রেরা পাঠকের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এইসব নারীদের মধ্যে আবার কয়েকজনকে গণিকা বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে। এইসব গণিকা নারীর জীবন চিত্রণে শরৎচন্দ্রীয় 'সতীনারী' ভাবনাকে লেখক অস্বীকার করেছেন। এবিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, মূলত সমাজ মানসিকতার কারণেই তাদের এই পাপের পথে নামতে হয়েছে। এই মতের সমর্থন আছে ড. সমরেশ মজুমদারের বক্তব্যে—

''সাধারণভাবে তাঁর সাহিত্যের নারীদের মধ্যকার একজন বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে, তার জন্য ব্যক্তির নিজের মানসিক প্রবণতা দায়ী নয়, দায়ী সমাজ ব্যবস্থা, বলা ভালো কিছু মানুষের আচরণ তাঁকে এই পথে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছে, সেই দয়া, মমতা, স্নেহ—তথাকথিত কোমল ব্যাপারগুলি নিয়েই তার সমগ্রতা। মূলত সতী, অবস্থা বিপাকে তাকে ঘৃণ্য বৃত্তিটির অন্তর্ভুক্ত হতে হয়েছে। এই যে একটি মিথ্যের আবরণ, তাকে সরিয়ে বস্তুর বাস্তবিক চেহারাটি দেখিয়েছেন বলেই জগদীশ গুপ্ত অনেকাংশে দলছুট এবং স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত।''[৩৭]

একটি সার্থক উপন্যাসের কাহিনী বা প্লট নির্মাণ, চরিত্রের যথাযথ রূপায়ণ, কিংবা

রচয়িতার জীবন দর্শনের প্রকাশ—সবক্ষেত্রেই বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে ভাষার। কারণ ভাষাই হল প্রকাশ মাধ্যম। এই ভাষার মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে লেখকের জীবনদৃষ্টিও। এসবের সার্বিক প্রতিফলনে গদ্যভাষা বিশেষ কার্যকরী। তবে পদ্যাকারেও উপন্যাস লেখা যেতে পারে। সবটাই নির্ভর করে রচয়িতার ভাষাগত দক্ষতার উপরেই। ভাষার এই প্রায়োগিক দিকটি সম্পর্কে সমালোচক ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার লিখেছেন—

''উপন্যাসের ভাষায় কাব্যরস অনেক সময়ই কৃত্রিম হয়ে পড়ে এবং অযথা বিশ্লেষণে লেখক যে কৃত্রিমতা সৃষ্টি করেন, তাতে মনে হয়, বিষয়কে তিনি উপযুক্ত ভাবে ধরতে পারছেন না; বিশ্লেষণ দিয়ে সেই ক্ষতিটুকু পূরণ করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বিষয় সম্পর্কে লেখকের ধারণা যদি আন্তরিক হয়, তাহলে উপন্যাসের ভাষা, উপমা, চিত্রকল্প সমস্তই বিষয়ের তাৎপর্যকে ব্যক্ত করতে এগিয়ে আসে।''[৩৮]

জগদীশ গুপ্ত তাঁর নির্মোহ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা জীবনকে দেখেছিলেন ব'লে তাঁর উপন্যাসের ভাষাও হয়ে উঠেছে সেই জীবনানুসারী। এই জীবনদর্শন অনেক ক্ষেত্রেই বাঁকা বলে লেখকের গদ্যশৈলীতেও সাহিত্য সৃষ্টির প্রথাগত ভঙ্গি বর্জিত হয়েছে। একটি বস্তুবাদী মানুষ জগৎ ও জীবনকে যেভাবে দেখেন, সেভাবেই জগদীশ গুপ্ত দেখেছেন। ফলে তাঁর উপন্যাসের ভাষা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিফলিত করেছে। সেই ভাষায় যেমন সাংবাদিক সুলভ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তেমনি রয়েছে ভাবাবেগ বর্জিত বর্ণনা, গাণিতিক যুক্তির প্রয়োগ; সেইসঙ্গে আঙ্গিকগত দিক থেকেও নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। লেখকের উপন্যাসগুলির ভাষাগত প্রায়োগিক ক্ষেত্রটির মধ্যে আমরা যে পৃথক পৃথক রূপ প্রত্যক্ষ করি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- লেখকের কাহিনী বর্ণনার ভাষা
- চরিত্রের মনোলোক আর বাহ্যসত্তার ভাষা;
- উপমা-চিত্রকল্প ইত্যাদির ব্যবহার এবং
- বাক্য গঠনের স্বাতন্ত্র্য।

■ **লেখকের কাহিনী বর্ণনার ভাষা :**

'দুলালের দোলা' এবং 'আলুনী আলু' বাদ দিলে জগদীশবাবুর বাকী উপন্যাসগুলি প্রথম পুরুষে অর্থাৎ লেখক নিজেই বর্ণনা করেছেন। 'দুলালের দোলা'য় শহরবাসী একজন মানুষের চোখে গ্রামীণ জীবনচিত্র তারই ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর 'আলুনী আলু'তে একটি দেড় বছরের মেয়ের জবানীতে কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এতো ছোট একটি মেয়েকে দিয়ে কাহিনী বর্ণনার কোন পূর্ব এমনকি পরেও কোনো উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে নেই। এই বিষয়টিকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেবার জন্যে লেখককে অলৌকিকতার সাহায্য নিতে হয়েছে। বাকী উপন্যাসগুলিতে লেখক নিজেই কাহিনীর ন্যারেটর। উপন্যাসগুলির অন্দরমহলে পৌঁছলে আমরা দেখতে পাই এগুলিতে মূলত গ্রামীণ জীবনই বর্ণিত হয়েছে। কুষ্ঠিয়ার গ্রামীর পরিবেশে লেখকের যে ছেলেবেলা কেটেছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে এইসব বর্ণনায়। আর আদালতে টাইপিস্টের চাকরী সূত্রে যে বিচিত্র মানুষগুলোকে দেখেছেন তাদের যাপন চিত্রই তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নির্মোহ ও নিরাসক্ত ভঙ্গীতে। 'যথাক্রমে' উপন্যাসের সূচনাতেই তিনি গ্রামীণ একটি অখ্যাত নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন—

''ছোট্ট নদীর ধারে হাট। গ্রামের নাম বেতডাঙ্গা, নদীর নাম চন্ননা, হাটের নাম চন্ননার হাট। নদীর বুক বৃদ্ধার স্তনের মত শুকাইয়া আসিতেছে, তবু স্তন্যের মায়ামধু কৃতজ্ঞ স্তন্যপায়ী সন্তানেরা ভুলিতে পারে না, চন্ননাকে ভালবাসিয়া হাটের নাম দিয়াছে চন্ননার হাট।''[৩৯]

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত খোর্দ মেঘচামী গ্রাম ছিল জগদীশ গুপ্তের পৈত্রিক নিবাস। চন্দনা নদীর তীরবর্তী গ্রামটির প্রকৃত নাম ছিল মেঘচুম্বী যা লোকমুখে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে 'মেঘচামী' নামে পরিচিতি পেয়েছিল। বাস্তবের 'চন্দনা' নদীই হয়তো হয়ছে চন্ননা আর 'মেঘচামী' হয়েছে 'বেতডাঙ্গা'। লেখকের পিতামহ আনন্দমোহন ছিলেন সেকালের ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার ডাকসাইটে আইন ব্যবসায়ী। সেইসঙ্গে তাঁদের ছিল জোতদারী। মেঘচামী গ্রামে তাঁদের ছিল দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র যার ফসল উঠলে উৎসব ক্রিয়া উপলক্ষে গৃহের প্রায় সকলেই গ্রামের বাড়ীতে যেতেন। সকলের মিলনের আনন্দে পরিবেশটাই সম্পূর্ণ বদলে যেত। 'রোমন্থন' উপন্যাসে তিন শহরবাসী ভাইয়ের

গ্রামজীবন দর্শনের অভিজ্ঞতা কিংবা 'দুলালের দোলা'য় নীরদবরণের গ্রামে গিয়ে শিকড় অনুসন্ধানের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ খুঁছে পাওয়া যায়। কিংবা আদালতের টাইপিস্টের চাকরী সূত্রে লেখক রাঁচীতে ছিলেন সপরিবারে। সেখানকার মহানদীর যে রূপ তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল সেকথাও তিনি হয়তো তুলে ধরেছেন।

জগদীশবাবুর মা সৌদামিনী দেবী ছিলেন একেবারে ছেলে অন্ত প্রাণ। ছয় পুত্র কন্যার মধ্যে চারজনই অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় মায়ের স্নেহের অবলম্বন ছিল কনিষ্ঠ জগদীশ। সেজন্য তিনি ছেলেকে ছেড়ে একা থাকতেই পারতেন না। মায়ের সঙ্গে এই বন্ধনের কথাই উত্তরকালে 'রোমন্থন' উপন্যাসে ছোটবাবুর সঙ্গে তার মায়ের কথোপকথনে ধরা পড়েছে—

"... তোদের খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হবে। ছোট'র ত' বিছানার চাদর শোবার আগে ঝেড়ে না দিলে সে রাত্রে আর ঘুম হয় না। তুই কেন যাচ্ছিস্ তুই থাক। বলিয়া গৃহিনী ছোটছেলের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

ছোটবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন— ঐ করেই তো তোমরা মায়েরা বাঙালী ছেলের মাথা খাও।"...[৪০]

লেখকদের কুষ্ঠিয়ার বাড়ীর খুব কাছেই একটা পতিতা পল্লী ছিল। সেখানে অনেক ঘর পতিতার বাস ছিল। গিরিবালা নাম্মী এক পতিতার সঙ্গে তাঁদের বাড়ীর যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল যে বালক জগদীশকে খুব ভালোবাসত। এই গিরিবালাই হয়তো উত্তরকালে 'লঘুগুরু'র উত্তম কিংবা সুদরী হয়েছে। এইভাবে ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার টুকরো টুকরো কোলাজ দিয়েই উপন্যাসগুলির কাহিনী গড়ে উঠেছে। সেই কাহিনী বর্ণনার ভাষা লেখকের কষ্ট কল্পনা প্রসূত নয়। সেইসঙ্গে আদালত চত্বরে দেখা মানুষগুলির নগ্ন চেহারাই ফুটে উঠেছে 'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' উপন্যাসের আদালতের দৃশ্যে। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে শব্দ চয়ন করে করেই এইসব কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণ করেছিলেন। স্বভাবতই তাঁর বর্ণনার ভাষা একেবারে 'গৃহস্থপাড়ার ভাষা' হয়ে উঠেছে।

■ **চরিত্রদের মনোলোক আর বাহ্যসত্তার ভাষা :**

সমাজ সংসারের মানুষের দুটি স্বতন্ত্র রূপ রয়েছে। আচরণের মানুষ আর আচরণের আড়ালের মানুষ। লেখক অত্যন্ত খোলা চোখে মানুষের এই দ্বৈত সত্তার ভাষাকে প্রাঞ্জল করে তুলেছেন। আদালতে প্রতিদিন যে মানুষেরা আসত তাদের ভাষা ছাড়াও, কুষ্ঠিয়ার গ্রামীণ পরিবেশে আর যাদবপুরের কাছে রামগড় কলোনীর জীবন লেখককে ভাষা সঞ্চয়ে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। শুধু তাই নয় পথচারীদের কথোপকথন তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শুনতেন। এবিষয়ে চারুবালা দেবী জানিয়েছেন—

''তখন তো পর্দা প্রথা ছিল। কখনো হয়তো এক গলা ঘোমটা দিয়ে ওঁর সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছি। দু'জন নিম্নশ্রেণীর পুরুষ বা মেয়ে মানুষ রাস্তায় ঝগড়া করছে, উনি দাঁড়িয়ে পড়ে যতক্ষণ সম্ভব ঐ ঝগড়া শুনতেন।''[৪১]

এইসব অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা এবং তাদের ভাষা। এই ভাষা নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করেছেন ড. ক্ষেত্র গুপ্ত। তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছেন—

''...তাঁর লেখা যে একটু দুরূপ তাতে সন্দেহ নেই, ভাষায় কৌতুক না থাক ব্যঙ্গের ছটা আছে, কিন্তু লঘু তরলতা নেই। কোথাও মজা নেই। আনন্দ উল্লাস নেই। মানুষের অবচেতন অন্ধকারের কারবারী লেখক কোথাও আলোর কণামাত্র অবশিষ্ট রাখেন নি।''[৪২]

ড. গুপ্তের এই সমালোচনার মধ্যে জগদীশবাবুর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যসহ ভাষাগত দিকটিও প্রকট হয়েছে। তাঁর ভাষায় কৌতুক নেই, ব্যঙ্গ আছে এবং লঘু তরলতা নেই। আসলে লেখকের চরিত্রেরা কেউই তাঁর রোমান্টিক কল্পনা বিলাসিতার ফসল নয়। কিংবা তিনি এইসব চরিত্রদের নিয়ে কোনো ইচ্ছা পূরণের গল্প লেখেননি। ফলে 'সিরিয়াস' কাহিনীতে মজা বা আনন্দ উল্লাস না থাকাই স্বাভাবিক। বরং যেটা আছে তা হল উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রের অন্তর্সত্তা আর বহির্সত্তার অনুসারী ভাষার সুনিপুণ প্রয়োগ। 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসে সিদ্ধার্থর ছদ্মবেশে নটবরের দুটি পৃথক সত্তা লেখক উপন্যাসের সূচনাতেই উল্লেখ করেছেন। বাইরে ঋজু বলিষ্ঠ গৌর বর্ণ, মুখে বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে যে নটবরের; তার ভেতরটা অন্যরকম—

''... কিছুদিন হইতে সেখানে অগ্নিগিরির অগ্নিবমন শুরু হইয়া গেছে। ভিতরে সে

শ্রান্ত, অতিশয় পরামুখাপেক্ষী।"[৪৩]

এই দ্বিমুখী লড়াইয়ে ক্ষত-বিক্ষত সিদ্ধার্থ তার বন্ধু দেবরাজকে বলেছে, 'বড় অন্ধকার, বন্ধু'। কিন্তু দেবরাজ তা মানতে চায়নি। বরং সে সিদ্ধার্থের মধ্যে দিব্যি দিনের আলোর মত জোছ্না দেখতে পেয়েছে। ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থ জীবনের একটা পর্বে এসে আত্মহত্যার কথা পর্যন্ত ভেবেছে। কিন্তু অজয়ার সংস্পর্শেই আবার সে নতুনভাবে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন কাশীনাথের উপস্থিতিতে অজয়াকে বিয়ের শেষ মুহূর্তে সিদ্ধার্থের মুখোশ খসে পড়েছে তখন সে শামুকের মতো গুটিয়ে গিয়ে বলেছে—

"...আমি নিরপরাধ। নিয়তির চক্রান্তে ভালোবেসেছিলাম। ভালোবাসার তাড়নায় আর প্রতিদানের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমি ত'সেই মানুষ।"[৪৪]

এই দ্বৈতসত্তাই সিদ্ধার্থকে পুরোপুরি 'ভিলেন' করেনি। লেখক সিদ্ধার্থের এই পৃথক সত্তার ভাষা নির্মাণে পুরোপুরি সফল।

'লঘুগুরু' উপন্যাসে বারাঙ্গনা উত্তমের উত্থান-পতনময় জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, পরিস্থিতি অনুযায়ী উত্তমের ভাষা বদলে বদলে গেছে। বহু পুরুষচারিণী উত্তমের মধ্যে গৃহ বুভুক্ষা ছিল বলেই প্রথমাবধি তার মধ্যে গৃহী নারীর ভাষা শুনতে পাই। বিশ্বম্ভরের সঙ্গে চলে আসার আগে উত্তম টুকরো টুকরো সংলাপে নিজেকে ক্রম উন্মোচিত করেছে। বিশ্বম্ভর টুকীর প্রসঙ্গ তুলতেই উত্তম বলেছিল, 'তা থাক্, আমি ত পুতনা নই'। গৃহস্থালী পাতানোর স্বপ্ন নিয়ে বিশ্বম্ভরের গৃহে এলে টুকীর সঙ্গে তার পরিচয় পর্বে তাকে একজন সত্যিকারের গৃহী জননী বলেই মনে হয়েছে। আবার বিশ্বম্ভরের প্রতিবেশিনীদের কাছে উত্তম নিজেকে দৃঢ়ভাবেই ব্যক্ত করেছে। মোহিনীর জিজ্ঞাসার উত্তরে উত্তমের খুব কাটাকাটা জবাব ছিল—

"ঘরের আমার ঠিকানা ছিল না; যেখানে থাকতাম সেই ঘর।"[৪৫]

কিংবা "ধরণ দেখে বা না দেখেই যা ভেবেছ তাই ঠিক।"[৪৬]

এই উত্তমই আবার হিরণের মৃত্যু সংবাদে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। মোক্ষর মা টুকীকে ডেকে কানে কানে 'তোর মা বেশ্যে ছিল' — বলার পরেই মেয়ের কাছে সেকথা শোনার পর উত্তমের

আর নিজের ইচ্ছা শক্তিজাত কোনো সংলাপ ছিল না। কেবল বিশ্বম্ভরের বন্ধুদের নিয়ে মদের আসর বসানোর ক্ষেত্রে তার দৃঢ় মনোভাবজাত কথা আমরা শুনতে পাই। টুকীর বিয়ে ভেঙে যাওয়া থেকে শুরু করে পরিতোষের সঙ্গে বিবাহ আর তার জীবনের বিপর্যয় পর্বে আমরা উত্তমকে শুধু বঙ্গ জননীর মতোই চোখের জল ফেলতে আর মেয়েকে সৎ উপদেশজাত কথা বলতেই দেখি। লেখক উত্তমের পতিতা জীবনের বিস্তারিত পরিচয় দেননি। কেবল বারবার চরিত্র বদল করা উত্তমের জীবনকে একটা পূর্ণাঙ্গ নারী হিসেবে অনায়াসেই খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে উত্তমের ভাষা তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য সূচক।

বিশ্বম্ভর চরিত্রকে আলাদা করে চেনা যায় তার নিজস্ব ভাষা-ভঙ্গিমার জন্য। প্রথমদিকে উচ্ছৃঙ্খল স্বামী, উদাসীন পিতা, পরে উত্তমের শাসনে গৃহী হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত অসহায় কন্যার পিতা হিসেবে লেখক কাহিনীতে তার ভূমিকা শেষ করেছেন। প্রথমা পত্নী হিরণ তারই দোষে সন্তান-সম্ভবা অবস্থায় মারা গেছে। সেই ঘটনা সে নির্বিকার চিত্তে উত্তমকে জানিয়েছে তাই নয় সেজন্যে উত্তমের কান্নাকে সে ব্যঙ্গ করতেও ভোলেনি। উত্তমের কান্নার প্রতিক্রিয়ায় 'হো হো' করে হেসে উঠেছে। এবং বলেছে—

''কার শোকে কে কাঁদেরে বাবা, তার দিশে পাওয়া ভার—মাছ মরলে বিড়াল কাঁদে, গরু মরলে শকুন; আর পদির পিসি কাঁদে পদি মারলে বলে উকুন।''[৪৭]

এরপর মোক্ষর মা উত্তমকে 'বেশ্যা' বললে কিংবা বন্ধুরা মদের আসর বসানোর অনুমতি না পেয়ে উত্তমকে 'খাণ্ডারী' বললে সেসব নিয়েও বিশ্বম্ভর প্রতিবাদ করেনি, বরং উপভোগ করেছে বদনামটা। কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে উত্তমের প্রতি তার গোপন ভালোবাসার কথাও উচ্চারণ করেছে। লেখক জানিয়েছেন—

''আমি তাহাকে ভালবাসি, সেও ভালবাসে—এককালে সে দশজনের পক্ষে সুলভ ছিল বলিয়াই, কেবল সেই কারণেই, এখনও তাহাকে হাটের মধ্যে নিজে ডাকিয়া আনিয়া সুলভ প্রাপ্যের দলে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহাই বা কেমন কথা! তাহাতে কোন লাভ নাই, বরং লোকসানের ভয় আছে—তাহাকে চিরদিনের মতো হারাইবার ভয় আছে।''[৪৮]

কিন্তু এই ক্ষণিক ঢেউ মিলিয়ে যেতে সময় লাগে নি। তারপর উত্তমের গৃহী হয়ে ওঠার চেষ্টা

থেকে শুরু করে টুকীর বিয়ে ভেঙে যাওয়া সবক্ষেত্রেই উত্তমকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দোষারোপ করেছে বিশ্বম্ভর। শেষ পর্যন্ত 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' বিশ্বম্ভরের মধ্যে একজন অসহায় পিতাকেই আমরা দেখি। মায়ের জন্য উদ্বিগ্না কন্যাকে আশ্বস্ত করে বলেছে—

''সে মরবে না। কিন্তু তোর কি হয়েছে বল্ দেখি? কাহিল হয়ে গেছিস।''[৪৯]

কিংবা টুকী সংসারে ঠিকঠাক মানিয়ে নিতে পেরেছে কিনা সেটাও জানতে চেয়েছে। বিশ্বম্ভরের এই ভাষায় কোনো কৃত্রিমতা নেই।

'কোমর বাঁধা শয়তান' পরিতোষের ভাষা তাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। ঠক-প্রবঞ্চক এই চরিত্রটির অন্তঃপ্রকৃতির বিপরীতে বহিঃপ্রকৃতিটি যথার্থই 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণের মতো'। বিপত্নীক পরিতোষ রক্ষিতা সুন্দরীকে নিয়ে কদর্য জীবন কাটানোর পাশাপাশি মূলতঃ অর্থের লোভেই টুকীকে বিয়ে করেছে। অথচ এহেন মুখোশধারীর বাহ্যরূপ ছিল এরকম—

''পরিতোষ বাজনা থামাইয়া, খোলের পেটির উপর দু'হাত তুলিয়া দিয়া বলিল,—এমন আশু ফলপ্রদ জিনিষ আর নেই ভাই, এই খোল যেমন চাটি মেরেছ কি মন সাদা; শ্রী গৌরাঙ্গদেবের নিজের আবিস্কার—তিনি পূর্ণতার অবতার কিনা।''[৫০]

টুকীর সঙ্গে তার আচরণের ভাষা কিংবা বিশ্বম্ভরের সঙ্গে শ্বশুর-জামাতার সম্পর্ককে কদর্য রূপে ব্যক্ত করার যে প্রকাশ-রূপ ভাষা সে প্রয়োগ করেছে, তাতে লেখকের মৌলিকত্বের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে।

পরিতোষের রক্ষিতা সুন্দরীর কদর্য ও ভোগমুখী জীবনযাপনের যে অকপট প্রকাশ, তাতে তাকে অনায়াসেই লেখকের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফসল বলা যায়। বিশেষ করে তার ভাষা সে পরিতোষের সঙ্গেই হোক, কিংবা টুকীর সঙ্গে তার মধ্যে একটা রূপরেখা তৈরী হয়ে গেছে। কীর্তনে ডুবে থাকা পরিতোষের অভাবের সংসারে সুন্দরীর আক্ষেপ—

''... তোমায় নিয়ে আমার চিরকালই দুঃখ গেল। দুঃখে ভাজা হয়ে গেছি।''[৫১]

আবার টুকীর বিয়েতে পাওয়া নগদ সমস্ত টাকা চুরি হয়ে গেলে সুন্দরীর বিলাপের যে পরিচয় লেখক দিয়েছেন তাতে মনে হয় না এই চরিত্রের ভাষা আরোপিত। অথবা উপন্যাসের শেষে টুকীর খদ্দের অচিন্ত্যর সামনে টুকীকে আক্রমণ করে সুন্দরী বলেছে—

''ওরে আমার সোয়ামী উলি, বেরো বল্‌ছিস কাকে তুই? কার ঘরে তুই আছিস্‌ জানিস?''[৫২]

এই ভাষা একজন প্রকৃত বারাঙ্গনাকে চিনিয়ে দেয়।

উত্তম থেকে টুকী—নারীর পরম্পরার যে ইতিহাস তা আসলে একটা পূর্ণবৃত্ত। মাতৃহীনা টুকীর প্রথম ভাষা ছিল সংক্ষিপ্ত প্রায় অর্থশূন্য। সকলের ডাকেই সে শুধু বলতো 'উঁ'। তারপর নতুন মা উত্তমের কাছেই তার জীবনচর্যার পাশাপাশি ভাষা শিক্ষা। বেশ্যার অন্তর্গত নির্মল ও পবিত্র মাতৃসত্তার কাছে সঠিক শিক্ষা পেয়েছিল বলেই টুকী মোক্ষর মায়ের বিষযুক্ত কথন 'তোর মা বেশ্যে ছিল'; এর কোনো জবাব দিতে পারে নি। বরং মায়ের কাছেই জানতে চেয়েছে 'বেশ্যে কী?' এরপর তার বেড়ে ওঠা, দুর্বিসহ দাম্পত্য জীবন নীরবে মেনে নেওয়া এবং স্বামীর যাবতীয় অবহেলা সত্ত্বেও সনাতন ভারতীয় নারীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হওয়া কিংবা কোনোরূপ কদর্য ভাষায় কথা বলার কোনো দৃষ্টান্ত কাহিনীতে নেই। সংক্ষিপ্ত ও সংযত ভঙ্গীতে সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তার পরিণতি বুঝতে পেরে প্রথম খদ্দের অচিন্ত্যকে বলেছিল—

''এ কাজ যদি করতে হয়, তবে আমি আপনাকে দেব দেহ, আপনি আমাকে দেবেন টাকা। মাঝখানে ওরা কে?''[৫৩]

এরপর স্বামীর ভিটে ছেড়ে 'ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অন্ধকারের' মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় টুকী। এই নীরব ভাষাও টুকীর প্রতিবাদী সত্তাকে চিনিয়ে দেয়। এইভাবে লেখক অপ্রধান চরিত্র লালমোহন বঙ্কু প্রমুখেরও একটা স্বতন্ত্র কথন বিশ্ব রচনা করেছেন অত্যন্ত সফলভাবে।

'নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসে নন্দ এবং কৃষ্ণা ছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র মণীন্দ্রবাবু। তারই পুত্রের গৃহ শিক্ষক হিসেবে নন্দর আগমনে কাহিনীর সূত্রপাত। মণীন্দ্রবাবুর রক্ষিতা কৃষ্ণার অর্ধনগ্ন শরীর আয়নায় দেখে ফেলে নন্দ। সেইসূত্রেই তার মধ্যে সু এবং কু'র দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। প্রথমে সে পালিয়ে যায়, পরে আবার ফিরে আসে। স্ত্রী মমতার কথা ভেবে তেইশ বছরের যুবক নন্দর প্রথমে অপরাধবোধ কাজ করে। স্ত্রীকে ভালোবেসে আদর করেও সে কৃষ্ণার রূপ ভুলতে চেয়ে পারেনি। স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে তার বাহ্যিক সত্তার প্রকাশ অন্তরস্থ সত্তা থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। বরং কৃষ্ণাকে নিয়ে তার অবৈধ আসক্তি প্রকট হতে থাকে। দুটি

ক্ষেত্রেই নন্দর সংলাপ তাকে চিহ্নিত করে দেয়। উত্তম যেখানে গণিকা জীবন ছেড়ে গৃহীনারী হয়ে উঠতে চেয়েছিল, কৃষ্ণা সেখানে গৃহান্তরালে থেকে গণিকার জীবন কাটিয়েছে। প্রৌঢ় মণীন্দ্রর সঙ্গে তার যৌন সম্পর্কের অতৃপ্তি সে নন্দর মতো পুরুষের সঙ্গে মেটাতে চেয়েছে বারবার। নন্দকে অকপটে বলেছে—

''পালাবেন না; আমাকে আয়নায় যেমন দেখেছেন, তেম্‌নি দেখা আমার ভালো লাগে, আপনাকে আরো—আপনি নির্ব্বোধ, তাই দিশে পান না, পালান্‌।''[৫৪]

অন্যদিকে মণীন্দ্রবাবু বাহ্যত সন্তানের পিতা, কিন্তু তার অন্তরে একজন কামুক, শরীর সর্বস্ব মানুষ বাস করে। পুত্রের গৃহ শিক্ষক, বয়সে প্রায় সন্তানতুল্য নন্দর সঙ্গে তার কথোপকথন তাকে নগ্ন করে তোলে। বাড়ীতে গিয়ে কতবার স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক মিলনের সুযোগ পাবে তার হিসেব করে, দু'রাত্রির অতিরিক্ত ফেরার গাড়ির প্রসঙ্গ তুলে সে বলেছে—

''... দিনে গাড়ি কখন?

— তিনটেয়।

- তাহলে দুপুরটাও পাচ্ছ। বলিয়া মণীন্দ্র সম্পর্ক বিগর্হিত এবং বয়সের তারতম্য হিসাবেও অত্যন্ত অনুচিত একটা ইঙ্গিতের হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন।''[৫৫]

শুধু তাই নয়, কৃষ্ণা যে তার স্ত্রী নয়, সম্পর্কীয় বোন অথচ কৃষ্ণার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকেই লুট করেছিল একদিন এমন কথাও নন্দর কাছে নির্দ্বিধায় বলেছে। তার এইসব সংলাপ একজন 'নষ্ট' পুরুষকে চিনিয়ে দেয়।

'রোমন্থন', 'দুলালের দোলা' এবং 'যথাক্রমে'—গ্রাম জীবন কেন্দ্রিক এই ত্রয়ী উপন্যাসে শহর ও গ্রামীণ মানুষের পৃথক সত্তা চিহ্নিত কথোপকথন, গ্রামীর মানুষের অন্তর্গত নীচতা কদর্যতা ফুটে উঠেছে তাদের আচরণ ও সংলাপে। 'দুলালের দোলা'য় গ্রামীণ জীবনে জাতপাতের নোংরামো দেখে নীরদবরণের শিক্ষিত সংস্কারমুক্ত সত্তা প্রতিবাদ করে বলেছিল—

''... আগে মানুষ, তারপরে ভদ্র-অভদ্র, সকলের শেষে ব্রাহ্মণ-শূদ্র। সংস্কার আগে নয়, গুণ আগে, আপনাদের এই কথাটা মনে করবার সময় এসেছ। আমাকে ক্ষমা করুন।

আপনি আমাকে দিয়ে এঁটো বাসন মাজাতেন কিনা জানিনে, আপনি তা' করাবেন না প্রতিশ্রুতি দিলেও আমি ব্রাহ্মণ বাড়ী খেতে যাব না।"[৫৬]

এর জবাবে ব্রাহ্মণের ভেতরের অশুভ সত্তাটি চিৎকার করে উঠেছে—'বালক, তুমি ব্রাহ্মণকে চেন' না।' এরপরেই নীরদবরণের সমস্ত কিছু চুরি হয়ে গেছে দুশো সিঁদেল চোরের সর্দার ব্রাহ্মণের হুকুমে। এমন অসুস্থ সমাজে পিরু চরিত্রটি বিবেকের মতো, সে যেন গোবরে পদ্মফুল, তার কণ্ঠে লেখক সমস্ত সমাজের এবং সমাজ মানুষের মানসিকতার প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন। বিয়ে সম্পর্কে তার অকপট সত্য কথন—

"আমি ভেবে দেখেছি, বাবু, ধর্ম্মপত্নী, স'ধর্ম্মিণী আরো অনেক কথার এমনি মানে নাই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল, তার দেহটাই আসল।"[৫৭]

'রোমন্থনে' তিন ভাইয়ের গ্রামদেশে আসার আগে বৈঠকখানার আড্ডায় গ্রামসমাজ ও গ্রামীণ মানুষ সম্পর্কে শহুরে মানসিকতা স্পষ্ট হয়েছে তাদের কথোপকথনে। অভয়ের মতো গ্রামীণ মানুষের জন্যে এদের আল্‌গা দরদ ঝ'রে পড়েছে। কালোশশীকে এক বাবু বলেছে—

"পল্লী ছাড়া কি আমাদের গত্যন্তর আছে? ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমরা খুব ভাবছি; আর চাষের কথাও আমাদের সভায় মাঝে মাঝে আলোচিত হয়—বিশেষজ্ঞ আছেন। খবরের কাগজে দেখে থাক্‌বে।"[৫৮]

অন্যদিকে 'যথাক্রমে' উপন্যাসে গ্রাম সমাজকে সুস্থ সুন্দর করে তোলার ব্যর্থতা শেষ পর্যন্ত ঝ'রে পড়েছে ডাক্তার নিত্যপদর জলমিশ্রিত ওষুধ তৈরী করার আদেশের মধ্যে। লেখক এইসব মানুষের ভাষা একেবারে মাটি ঘেঁষা জীবন থেকে তুলে এনেছেন। তাঁকে কোনরকম কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি।

লেখকের 'মহিষী' উপন্যাসের জ্যোর্তিময়ী 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের শরৎ, 'সুতিনী' উপন্যাসের রাজবালা, 'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসের কিশোরী—এইসব নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পেষণে কীভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে সেটা তাদের কখনো নীরব যন্ত্রণার ভাষা আবার কখনো প্রতিবাদের ভাষার মধ্যদিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। এইসব নারীদের বাহ্যসত্তা আর অন্তরের প্রদাহপূর্ণ অন্তমুখী সত্তা নিয়ে উপন্যাসে তাদের ভাবনাকে প্রকাশ করেছে। এই প্রকাশের

ভাষা নিঃসন্দেহে তাদের চরিত্রের বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছে। 'মহিষী'র জ্যোর্তিয়ী কালো ছিল বলে তাকে মোটা অংকের পণের বিনিময়ে তার পিতা বিয়ে দেন অর্থলোলুপ ব্রজকিশোরের একমাত্র সন্তান অশোকের সঙ্গে। প্রথমে আপত্তি করলেও পিতার চাপে অশোক কালো বউকেই গ্রহণ করে, কিন্তু যখনি পিতার অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়ে তখনি জ্যোর্তিময়ীর প্রতি তার বিদ্বেষ ঝ'রে পড়ে। সম্পর্কের বাঁধন আলগা হ'তে থাকে। নিছক দৈহিক চাহিদা মেটাতে জ্যোতির্ময়ীকে আছে টানতে চায় অশোক। প্রচণ্ড আত্মসম্মানে ক্ষত-বিক্ষত জ্যোতির্ময়ী স্বামীকে অস্বীকার করে বলে—

''... দিতে না এসে নিতে আসা তোমাদের পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু সম্পর্ক তাতে জন্মে না। আমরা তা পারিনে। ... শয্যাংশ দিয়ে যদি আমায় কৃতার্থ করবার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে তবে সে তোমার বৃথা আশা। ... তুমি যে ত্যাগ করেছিল, সেইটেই সত্য। মাকে বলেছি ক'নে দেখতে।''[৫৯]

দাম্পত্য সম্পর্ক কোন্ স্তরে নেমে গেলে নারী এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় জ্যোতির্ময়ীর সংলাপেই তার প্রকাশ ঘটেছে। ছেলের জন্য অন্ধকারে অপেক্ষারতা 'তাতল সৈকতে'র শরৎ যেভাবে কামুক মনোহর দত্তের দ্বারা 'বেশ্যা' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায় সেটা জ্যোতির যন্ত্রণার ভাষাতেই ফুটে উঠেছে। 'সুতিনী'র রাজবালা স্বামীকে সন্তান দিতে না পাবার যন্ত্রণাকে স্বামীর পৌরুষের দোষ বলে চিৎকার করে চাপিয়ে দিয়েছে—

''সাত বছর গোঙালে আমায় নিয়ে তুমি—রোজ এমন চমকালে এতদিন পাঁজরার হাড় ফেটে প্রাণ বেরিয়ে যেত তোমার। ... শনির মতো তুমি মানুষের কাঁচা মাথা সত্যিই চিবিয়ে খাও না; কিন্তু আমার অদৃষ্ট তুমি পুড়িয়ে দিয়েছ।''[৬০]

'গতিহারা জাহ্নবী'র কিশোরী স্বামীর লাম্পট্য থেকে মুক্ত হতে চেয়ে শেষ পর্যন্ত আবিস্কার করেছে সে মা হতে চলেছে। এই অসহায় মাতৃত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে মায়ের কাছে নিজেকে সমর্থন করেছে—

''তোমরা আমায় কেটে ফেল্‌তে পারো মা?... আমি কি করব বল। আমার পেটে ছেলে এসেছে। তোমার পায়ের তলায় আমি পড়লাম, যা খুশি করো তোমরা আমায় নিয়ে,

আমি আর পারছি নে।”[৬১]

কিংবা ‘দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা’ উপন্যাসে মল্লিকা নিজের জীবনের কথা ভেবে আর সন্তান গর্ভে ধারণ করতে চায়নি। প্রতিটি নারীর আর্ত-যন্ত্রণার ভাষা তাদের অন্তর্গত নারীসত্তাকে জীবন্ত করে তুলেছে। এই ভাষা প্রয়োগে কোথাও লেখকের আন্তরিকতার এতটুকু অভাব নেই। এছাড়া ‘রতি ও বিরতি’ উপন্যাসে পুত্রহারা পিতা রাম ও মা গয়ামণির হাহাকারের ভাষা, ‘নিদ্রিত কুম্ভকর্ণে’ কাপুরুষ শশধরের স্ত্রীর আত্মাভিমানের ভাষা কিংবা ‘নিষেধের পটভূমিকায়’ শঙ্কিতা জননী অভয়া, কন্যা শান্তি কিংবা অতুলের ভাষা বাস্তবের মৃত্তিকা থেকে উঠে এসেছে। ‘কলঙ্কিত তীর্থ’ উপন্যাসে লম্পট স্বামীকে গ্রহণ করতে না পারার নীরব যন্ত্রণার ভাষা যত জীবন্ত, শ্বশুর বাড়ী থেকে বিতাড়িতা মাখনের ত্রিলোকপতির সঙ্গে আদর্শায়িত দাম্পত্য তীর্থে মিলনের ভাষা ততটাই কাল্পনিক হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট যে লেখক যখনি তাঁর অভিজ্ঞতার গণ্ডী ছাড়িয়ে কল্পলোকে তাদের চরিত্রদের নিয়ে গেছেন, সেইসব ক্ষেত্রে আদর্শ আরোপিত ভাষা জীবন্ত হয়ে ওঠে নি।

■ **উপমা-চিত্রকল্প ইত্যাদির ব্যবহার :**

‘উপমা’ কথাটির অর্থ তুলনা করা। দুটি বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে তাদের কোনো অন্তধর্মের তুলনা বোঝাতে উপমার প্রয়োগ হয়। জগদীশবাবু তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই উপন্যাসের বর্ণনার ভাষায় যেমন উপমা ব্যবহার করেছেন, তেমনি চরিত্রদের বিমূর্ত মানসলোককে পরিস্ফুট করতেও দক্ষ ডুবুরির মতো জীবন সমুদ্রে অবগাহন করে বিচিত্র সব উপমাদি তুলে এনে তাঁর শৈল্পিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন।

■ ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’ উপন্যাসে হতাশ নকল সিদ্ধার্থ যখন আত্মহত্যার স্তর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে, তখন তার জীবনে সহসা আসে অজয়া। অজয়ার সেই আগমনকে লেখক রূপক অলংকারের চমৎকারিত্বে তুলে এনেছেন—

‘‘যাহাকে দর্শন মাত্রেই সিদ্ধার্থ ডিগবাজি খাইয়া মরণের তট হইতে জীবনের জ্যাতির্ম্মঞ্চে আসিয়া দাড়াইয়াছে, বলাবাহুল্য সে একটি নারী।”[৬২]

■ ''জলের চেয়ে রক্ত গাঢ় ইহা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই কথাটি যে, রোগের বীজের মতো অভ্যাসও যেন রক্তের আশ্রয়েই চিরজীবী হইয়া থাকিতে চায়।''[৬৩]

■ ''অজয়া পেন্সিলে ছবি আঁকিতেছিল—

পাহাড়ের ঠিক নীচেই একটি পল্লী; তার পশ্চিম প্রান্তে রৌপ্য প্রবাহের মতো নদীটি;[৬৪]

■ 'মহিষী' উপন্যাসে জ্যোতির্ময়ীর স্মৃতিচারণায় স্বামীর সঙ্গে কাটানো সোনালী মুহূর্তের ছবি ভেসে উঠেছে—

''... স্বামীর আদরগুলি একটা স্বচ্ছ নিরবচ্ছিন্ন স্রোতের মত কোথা হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতে থাকে—কাঙালীর মত কাতর চক্ষে চাহিয়া ক্ষণিকের তরে যেন তাহাই দুয়ার ধরিয়া দাঁড়ায়।''[৬৫]

■ ''... ঐ পর্যন্ত বলার পরই যেন সূত্র ছিঁড়িয়া অবশিষ্ট কথাগুলি মধুসূদনের বুকের ভিতর জড় একটা স্তূপের মত পড়িয়া রহিল।''[৬৬]

''পুত্রের জননীর আহত অন্তরের সত্যটি যেন সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত জ্বলন্ত একটা বিগ্রহের মত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।''[৬৭]

■ 'লঘুগুরু' উপন্যাসে খেয়া নৌকায় উত্তমকে দেখে আসার পর বিশ্বম্ভরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লালমোহনের ভাবনায় লেখক জানিয়েছেন—

''স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও বিশ্বম্ভর কয়েকবার আসিয়া দু'দশ দিন থাকিয়া গেছে; কিন্তু মুগ্ধ কবিবরের ছবির চক্ষের মত এমন উড়ুউড়ু বিমনাভাব তার কোনদিনই দেখা যায় নাই।''[৬৮]

■ ''পরিতোষের গাম্ভীর্য্য পর্ব্বতের গাম্ভীর্য্যের মত।''[৬৯]

■ ''টুকী যেন কেবল সে-ই নিরালম্ব প্রেতের মত আকাশ পাতাল হাতড়াইয়া তৃণাঙ্কুরের মতো ক্ষুদ্রতম একটা আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে।''[৭০]

■ 'দুলালের দোলা' উপন্যাসে শহরবাসী নীরদবরণের চোখে গ্রামীণ প্রকৃতির রূপ ধরা পড়েছে—

''চঞ্চল আলোকখচিত স্থির ছায়া মণিদীপ্ত অন্ধকারের মত প্রসারিত হইয়া আছে এবং

এই অপরূপ ভজনালয়ে পাখির দিবা বন্দনা তখনও শেষ হয় নাই।”[৭১]

■ ‘‘... বর্ষার ঐ ভরা নদী! আমরা যেন বুঝতে পারলাম, বাবু, নদীতে যেমন জল ধর্‌ছে না, বিধ্‌বে এই মেয়েটির বুকের চারপাশ তেমনি ভরা জলের ধাক্কায় ভাঙ্‌ছে।”[৭২]

■ ‘‘পল্লীর অপবিত্রতা নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিতেই যেন পবনদেব ঝাঁটাইতে শুরু করিয়া দিলেন।”[৭৩]

■ ‘যথাক্রমে’ উপন্যাসের একেবারে সূচনাতেই চন্ননা নদীর বর্ণনা করে লেখক জানিয়েছেন—

‘‘নদীর বুক বৃদ্ধার স্তনের মত শুকাইয়া আসিতেছে, তবু স্তন্যের মায়ামধু কৃতজ্ঞ স্তন্যপায়ী সন্তানেরা ভুলিতে পারে না।”[৭৪]

■ ‘‘আমের আঁটির বাঁশী তৈরীর তখনই সময়, ছাইগাদায় দু'টি মাত্র পাতা লইয়া ডাঁটাটা বাহির হয়, সাপের কচি বাচ্চার মত লিক্‌লিকে আর মসৃণ।”[৭৫]

■ ‘‘বলিতে বলিতে মধুরতার সজীব মূর্তির মত মতিলাল অতি ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।”[৭৮]

‘তাতল সৈকতে’ উপন্যাসে ঠাকুর চরিত্রের বর্ণনা এরকম—

‘‘গোঁফ-দাড়ি কবে কামান হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহাদের উদ্দাম-প্রাচুর্যে ঠাকুরের মুখখানা সশস্ত্র দুর্গের মত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে।”[৭৭]

■ ‘‘...যাঁর হাত দিয়া সৌভাগ্য সুখ মানিক বৃষ্টির মত অজস্র ধারায় মাতা পুত্রের মাথার উপর ছড়াইয়া পড়িবার কথা তিনি তখন কি মনে করিলেন তাহা তিনিই জানেন।”[৭৮]

■ ‘‘... মনোহরের প্রশ্নে প্রেতলোক অন্তর্হিত হইয়া ছায়াময় ইহলোক সহস্র বাহু রাক্ষসের মত তার দৃষ্টির সম্মুখে সহসা নাচিয়া উঠিল।”[৭৯]

■ ‘সুতিনী‘ উপন্যাসের রাজবালার বিগত প্রায় সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে লেখক জানিয়েছেন—

‘‘যৌবনের পরিপূর্ণতা তার দেহতটের বহু নিম্নে অবতরণ করিয়া শীতের নদীর মতো ক্ষীণ ধারায় বহিতেছে— তার উল্লাস নাই, তাহাতে শিহরণ নাই।”[৮০]

■ ''রাজবালা দাঁড়াইয়া আছে—নির্ব্বাত আকাশে দগ্ধীভূত মেদগন্ধের মতো তা' দুস্তর আর অবিচল।''[৮১]

■ ''সিঁথির দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া কেশগুচ্ছ কবরীর ভিতর ধরা পড়ে না—দুইটি অর্দ্ধবিকশিত পুষ্পকোরকের মতো ললাট স্পর্শ করিয়া ভাসিতে থাকে।''[৮২]

■ 'রতি ও বিরতি' উপন্যাসের সূচনায় রামের জীবনের একটি সোনালী দিনের স্মৃতিচারণা করানোর মধ্যদিয়ে লেখক বর্ণনা করেছেন—

''অসংখ্য দিন-প্রবাহের মাঝে সে দিনটি জ্বলন্ত একটি বুদ্বুদের মতো উত্থিত হইয়াছিল—এখনও যেন তাহা চোখের সম্মুখে দিবারাত্র হীরকের মত জ্বল জ্বল করিতেছে।''[৮৩]

■ ''নদী শান্ত—মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিতা কিশোরী কন্যার মত আনত সৌম্য নীলিমার স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টির নীচে সে যেন সুপ্তিমগ্ন আনন্দোজ্জ্বল পিতৃরূপী সূর্য্য তার শিয়রে দাঁড়াইয়া মনোহর লাবণ্য-ধারা কন্যার সর্ব্বদেহে মাখাইয়া দিয়াছে—দূর বনানীর নিস্পন্দ শ্যাম লেখাবিন্যাস যেন কিশোরীর অচঞ্চল বেণীর মত, অলস হইয়া উপাধানে পড়িয়া আছে—''[৮৪]

■ ''বুকের কোটের উপর সোনার মোটা চেন ঝুলিতেছে খানিকটা ধনুকের মত বাঁকা, খানিকটা তীরের মত সোজা হইয়া ঝুলিতেছে। ... পায়ের জুতো দর্পণের মত মসৃণ।''[৮৫]

■ 'নিষেধের পটভূমিকায়' উপন্যাসের সূচনাতেই মানুষের পরিচয় প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—

''প্রত্যেকটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, আর প্রত্যেকটি সামগ্রীর বিদ্যমানতা চিরনবীন আর ধৌত কাণ্ড প্রকৃতির মতো সুশোভন।''[৮৬]

■ ''আমাদের পত্নীদের পতিভক্তি কেমন জানো? গেরস্ত'র ভিক্ষুককে মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়ার মত।''[৮৭]

■ ''অভয়ার আঙুলগুলির সুকোমল মাধুর্য্য দেখিয়া চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলি যেন একটা অনায়াস স্রোতের মতো একটানা বহিয়া চলিয়াছে।''[৮৮]

■ 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসে ত্রিলোকপতির চোখে নারী মূর্তির বর্ণনা—

''... একটুখানি লম্বাটে' গড়ন—পরিপূর্ণতায় আর পরিমাণ পারিপাট্যে তার দেহের

অনিন্দ্য আনন্দ সুষমা যেন উৎসের মতো ঝরিতেছে; গতিতে একটি মৃদু লীলা আছে।”[৮৯]

■ ‘‘... এইরকম সব কারণেই মানুষের মনের মূল শুকাইয়া যায়—সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; মৃতের মতো অসাড় এবং অসাড় অবস্থায় দেহ বহন আর ভগবানে অবিশ্বাস করিতে থাকে।”[৯০]

■ ‘‘... উজ্জ্বলতার আবির্ভাব সে অনুভবই করে নাই—অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছে, দিক সীমানা পর্যন্ত মরুর মতো রিক্ত, অগ্নি নিঃশ্বাসে জর্জরিত, অভাবে বিধুর।”[৯১] এইভাবে একের পর এক উপন্যাসে লেখক অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে, জীবনের পরিচিত বৃত্ত থেকেই নানারকম উপমাদি চয়ন করে কাহিনী-চরিত্র চরিত্রের অন্তর্লোককে পরিস্ফুট করেছেন। এইসব উপমাদিতে কোনরকম কৃত্রিমতা নেই, একেবারে দেশজ উপাদানে এগুলি পরিপূর্ণ। এইসব অলংকারের পাশাপাশি চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখেছেন। ইংরেজী 'Image' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবেই চিত্রকল্প, রূপকল্প, কল্পচিত্র, বাক্ প্রতিমা ইত্যাদি ব্যবহৃত হলেও ‘চিত্রকল্প’ কথাটিই অধিক প্রচলিত। এই চিত্রকল্প যেন আবেগ সংরক্ত শব্দ চিত্র। এক্ষেত্রেও জগদীশবাবু তাঁর চারপাশের জীবন থেকে এইসব আবেগ সংরক্ত শব্দচিত্র নির্মাণ করেছেন অনায়াসে। তাঁর নির্মিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্প এরকম—

‘‘... অন্ধকার এইখানে। কান পেতে থাকো, একটা শব্দ শুনতে পাবে। ভগবানের অভিসম্পাত বুকের গহ্বর জুড়ে চেপে বসে আছে; তার ভেতর থেকে অবিশ্রান্ত উঠছে পৃথিবীর গোঙানি।”[৯২] — ‘অসাধু সিদ্ধার্থ’।

এই চিত্রকল্প সিদ্ধার্থ’র মানসিকতাকে প্রকাশ করেছে। এর কোনো বিকল্প ভাষা হয় না, কারণ নির্জ্ঞান মনের প্রকাশের এটাই একমাত্র পথ। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত প্রসঙ্গতঃ লিখেছেন—‘‘... এ জাতীয় চিত্রকল্প অনেক। রঙ সেখানে চড়া, ধ্বনি কর্ণবিদারী কখনো অনাহত—সব কটা ইন্দ্রিয় আবেদন উত্তেজক। এইভাবে একটা কল্প জগৎ তৈরী হয়ে ওঠে যা রুগ্ন মানসিকতার স্বভূমি।”[৯৩]

■ ‘‘নদীর জল তখন ‘ধীরে পবনে ঢেউ তুলিয়া’ নৌকার গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করিতেছে—পূর্বাহ্নের অনুতপ্ত রৌদ্র তখন সুন্দর—দিগ্বলয়লগ্ন সবুজের গায়ে সুন্দর নদীর

নির্মল জলে সুন্দর আকাশের নীল অঙ্গে সুন্দর।"[৯৪] — 'লঘু গুরু'

এখানে খেয়া পারাপারের সময় উত্তমকে দেখে বিশ্বম্ভরের কামজ ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে।

■ অদূরে অন্ধকার-মগ্ন সেই ফলবান বৃক্ষটিতে তখন নিশাচর পক্ষীর আগমন সশব্দ হইয়া উঠিয়াছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠ একটি কীট কর্কশ সুর অবিশ্রান্ত টানিয়া চলিয়াছে—ছায়াপথ স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে, দুটি সুবৃহৎ তেঁতুল গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে মেশামেশি হইয়া গেছে।"[৯৫] — 'লঘুগুরু'

দীর্ঘ এই সংরক্ত শব্দ চিত্রে টুকীর জীবনের আগামী দিনগুলির ভয়াবহতার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।

■ 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসে রাত্রি নেমে এলেও একমাত্র পুত্র ঘরে না ফেরায় মা শরতের অন্তরের অবস্থাকে লেখক একটি সুন্দর চিত্রকল্পের সাহায্যে তুলে ধরেছেন—

"... বাহিরের ঘন অন্ধকার ঘনতর হইয়া দূরের আকাশ দূরের দৃশ্য যেন চিরদিনের মত গলাধঃকরণ করিয়া অজগরের মত অগ্রসর হইতে লাগিল।... কলের চিম্‌নিটা, শ্বেত একটা অট্টালিকার খানিকটা, ফলশোভিত খর্জুর বৃক্ষটি, গৃহচূড়াগুলি...
চির পরিচিত যারা তারা চোখের সম্মুখে যেন অন্ধকারের জঠরে নিরবশিষ্ট হইয়া একে একে নিঃশব্দে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"[৯৬]

■ "... একটি শীর্ণদেহা কুক্কুরী ছুটিয়া আসিল পশ্চাতে তার পাঁচটি স্তন্য পিপাসু সন্তান, কুক্কুরী অদূরে পা মেলিয়া দিয়া মাথা খাড়া করিয়া শুইল; বাচ্চাগুলি স্তনে মুখ লাগাইবার শশব্যস্ত ব্যাকুলতায় কাহার ঘাড়ে কে চাপিল তাহার ঠিক রইল না।"[৯৭] — 'রোমন্থন'

গ্রামদেশকে যে পরিকল্পনাহীন ভাবে যে যার মতো দখল করে শ্রেণী বৈষম্য তৈরী করছে তার ব্যঞ্জনা এখানে ধরা পড়েছে।

■ "এতবড় আকাশের যেখানে যে জ্যোতির্বিন্দুটি ছিল মেঘের গাঢ় প্রলেপে তাহা একেবারে চিহ্নহীন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। থইথই অন্তহীন কালোর পাথারে পৃথিবী ডুবিয়া গিয়াছে।"[৯৮] — 'কলঙ্কিত তীর্থ'

নারী ঘটিত অপরাধ করে জেল প্রত্যাগত স্বামী সাতকড়িকে গ্রহণ করতে না পারার

প্রসঙ্গে স্ত্রী মাখনের মানসিক অবস্থা ব্যক্ত হয়েছে। এইভাবে প্রায় সব উপন্যাসেই জগদীশ গুপ্ত নানা অনুষঙ্গে চিত্রকল্পের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন অত্যন্ত যথাযথভাবে। এইসব চিত্রকল্পের প্রয়োগ সম্পর্কে সমালোচক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

''জগদীশ গুপ্তের গল্প, উপন্যাসে চিত্রকল্প প্রয়োগ তখনই সার্থক হয়েছে, যখন তিনি তার দ্বারা মানুষ ও প্রকৃতির অন্তঃসারকে ব্যঞ্জিত ও মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন। জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁর যে বক্র দৃষ্টি ছিল, তাও প্রতিফলিত হয়েছে চিত্রকল্পে।''[৯৯]

■ **বাক্য গঠনের স্বাতন্ত্র্য :**

জগদীশ গুপ্ত তাঁর উপন্যাসগুলির কাহিনী বর্ণনায় বাক্য প্রয়োগ যেভাবে করেছেন, তার মধ্যে দিয়েও লেখকের নিজস্বতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কাহিনী বর্ণনায় বহুক্ষেত্রেই সংযত বাক্ আবার কোথাও কোথাও তিনি অনেক জটিল ও দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করেছেন।

'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসে স্বামী অকিঞ্চনের লোলুপ নজরে পড়েছিল কিশোরীর সখি অপরা। তার না আসার কথা এবং কিশোরীর উদ্বেগহীনতা বোঝাতে লিখেছেন—

''অপরা আসিল না।

কিশোরী বাঁচিয়া গেল।''[১০০]

আবার অকিঞ্চনের এই পরনারী লোলুপতা নিয়ে মায়ের কাছে তার বকুনি খাওয়া এবং কিশোরীর কাছে ক্ষমা চাওয়া প্রসঙ্গে কিশোরীর মনের অবস্থা বর্ণনায় দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করেছেন লেখক—

''... পরস্ত্রীর প্রতি স্বামীর এমন নির্লজ্জ ক্ষুব্ধতা আর লোভের এমন বর্ব্বর প্রকাশ কোনো নারীর সহ্য হইবার কথা নয়; কিন্তু যে সজীব বাক্যগুলি কেবল মানুষের বারম্বার আবৃত্তিতে ফুসফুসের হাওয়া খাইয়া জীবন দৈর্ঘ্যে অনন্ত এবং স্ফীতিতে অনতিক্রম্য হইয়া আছে তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পা তুলিলেই ভ্রষ্ট হইতে হইবে, সে অপরাধের মার্জনা ইহকালেও নাই, পরকালেও নাই, ইহাই সনাতন নিয়ম; কারণ তলায় ক্ষুদ্রতম ছিদ্র থাকিলেই জলের কলসী যেমন অকেজো হইয়া যায়, তেম্‌নি তুচ্ছতম স্থানেও নিয়মকে লঙ্ঘন করিলেই লঙ্ঘনের প্রবৃত্তি সহজ হইয়া নিয়মকে ব্যর্থ করিতে পারে।''[১০১]

'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শরতের স্বামী মারা গেলে লেখক শুধু লিখেছেন—

''শরৎ বিধবা হইল।''[১০২]

আবার 'রোমন্থন' উপন্যাসের এক জায়গায় অভয়ের মনের গহনলোকের ছবি অংকন করেছেন এভাবে—

''সে জানে না যে, মানুষের মন দিগ্বলয়ের দিকে চাহিয়া মহাকালের হস্তান্দোলন দেখিতে দেখিতে একবার তার ছেদের অবসরে সূর্য্যাস্তের আলোক প্লাবন দেখিয়া মোহের আবেশে মৃত্যুকে বিস্মৃত হইতে পারে, সলিলাবর্তের মাঝে ঘুরিতে ঘুরিতে তলাইয়া যাইবার সময় মন চাঁদের দিকে চাহিয়া সে পথের কথা মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া যাইতে পারে, যে-পথে মৃত্যু তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, রাক্ষসের মুষ্ঠির ভিতর হইতেও মানুষ প্রিয়জনের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিতে পারে, সব অভিমান আর অনুভূতি নিষ্ক্রান্ত হইয়া মানুষ যখন কেবল পশুর ধর্ম্ম পালন করিয়া চলে, তখন লুপ্ত চৈতন্য যদি একবার ফিরিয়া আসিতে পায় তবে দানবীয় অন্ধ উল্লাসে একটি তরঙ্গে আসে।''[১০৩]

উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনায় অজস্র dots বা ফুট্‌কি চিহ্নের প্রয়োগ করেছেন অনেকটা মুদ্রা দোষের মতো। এই চিহ্ন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা এনেছেন। কখনো সময়ান্তর বা প্রসঙ্গান্তর বোঝাতে, কখনো ব্যাপ্তি বোঝাতে তিনি ব্যঞ্জনাগর্ভ এইসব ফুট্‌কি চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। যেমন 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসের একটি অংশে এরকম ফুট্‌কি চিহ্ন যুক্ত বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

''... অভাবের কথা উঠিতেই তাঁহার মুখে যে ছায়া পড়িত... শরৎ জানিত, তাহা বড় গুরুতর। ... স্বামীর মুখের প্রত্যেকটি রেখা তার পরিচিত... রেখার ইঙ্গিত সে কখনো ভুল বোঝে নাই—সেই পাঁচ বছর বয়স হইতে বিদুর তার খেলার সাথী... এক পলকে ভাব, এক পলকে আড়ি ... মারামারি, কাড়াকাড়ি—মাছের মাথা খাবো ব'লে দু'জনার সেই জিদ...''[১০৪]

'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসের একটি অংশ—

''... অসংখ্য যাতায়াত, অজস্র অর্থ ব্যয় ... কত কি বিশৃঙ্খলতা; কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনা

স্বতন্ত্র এবং স্পষ্ট ... তারপর সুদীর্ঘ সশ্রম কারাবাস ... দেহের শক্তি যেন নিঙ্‌রাইয়া বাহির করিয়া লইয়া তাহারা কাজে লাগাইয়াছে ... নিদারুণ দাসত্ব—"[১০৫]

'মহিষী' উপন্যাসের একটি বর্ণনা—

"... সরে যা ... সামনে থেকে ..। বেহায়া!

চক্ষের নিমেষে একটা বিপ্লব কাণ্ড ঘটিয়া গেল।' ... সংসারের কর্তা স্বরূপে ছেলেকে ও বৌমাকে শাসন করিয়া এবং স্ত্রীকে উপদেশ দিয়া ব্রজকিশোর চলিয়া গেলেন।... এবং অশোকের মনে দুঃসহ একটা অগ্ন্যুৎপাত শুরু হইয়া গেল ..."[১০৬]

ব্যাকরণ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতার জন্য জগদীশবাবু বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। যেমন সংযোজক অব্যয় হিসেবে 'এবং' এর পরিবর্তে প্রায়ই 'আর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'যথাক্রমে' উপন্যাসের একটি বর্ণনা এরকম—

"হাট তাঁর অর্থাৎ তাঁর মাটিতেই বসে, আর পরিণাম শঙ্কায় বিশেষ ব্যাকুল হইয়াই তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন... সেখানে একটা বাঁশের খুটির সঙ্গে লম্বা শিকল দিয়া সুগ্রীব বাঁধা থাকিত আর ঝিমাইত।... তারপর অনেকেই ... দাঁড়াইয়া সুগ্রীবের গ্রীবাভঙ্গী, ভোজনকৌশল আর চর্বণ পটুতা দেখে, আর তারিফ করে।... দীনবন্ধু আর সাবিত্রী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোনে, হাসির কথায় সকলের সঙ্গে হাসে, আর মানুষের আর রামপ্রসাদের ফাইফরমাশ খাটে।"[১০৭]

দীর্ঘ এই বর্ণনায় সংযোজক হিসেবে কোথাও 'এবং' ব্যবহৃত হয়নি। এমন অজস্র বর্ণনা উপন্যাসগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

শব্দ প্রয়োগের সময় তিনি খুব নিখুঁতভাবে 'Apostrophe' বা উর্ধ্ব কমা (') চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। তা'র, তা', তা'কে ইত্যাদি সর্বনাম ছাড়াও উচ্চারণে সাধারণত শব্দের শেষে যেখানে 'ও' এর উচ্চারণ হয় সেখানেও উর্ধ্বকমা ব্যবহার করেছেন। আবার শব্দের যত্রতত্র হস্ চিহ্ন (্) প্রয়োগ করেছেন উচ্চারণে বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে। কয়েকটি বাক্যাংশ উল্লেখ করা যায়—

- ঘর ছাড়তেই হ'ত।

- বেশী দূর ত' নয়।
- আপ্‌নি গেছে বেঁচেছি।
- ছেলে পিলেও হ'তে পারে দু'জনারই।
- ঢেঁকির ললাটে সিঁদুর মাখান'।
- বল্‌ব সার্, ভূতের চাইতেও গেছো, এখন দেখ্ মজা।
- ছেলেটা নিতান্ত বদ্‌মায়েস স্টুপিড্ ছেলে।
- পাট্ তুল্‌ছিনে শীগ্‌গির।
- পয়সার লেন্‌দেন্ ছিল।

এমন বর্ণনা উপন্যাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। শব্দ সচেতন শিল্পী হিসেবে লেখক চরিত্রানুযায়ী যেমন বাস্তবোচিত শব্দ ব্যবহার করেছেন, তেমনি তৎসম শব্দের পাশাপাশি অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, বিদেশী ইত্যাদি শব্দ অনায়াস ভঙ্গীতে প্রয়োগ করেছেন তাঁর বর্ণনার প্রয়োজনে। ব্যবহার করেছেন যত্রতত্র 'ড্যাস চিহ্ন' ('—')। যেমন—

- মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল।
- চক্কোত্তির পরিবার তার শোবার ঘরে।
- তারও নিব্বংশ হবার ভয় থাকে।
- ওদের মনে ঘেন্না নাই।
- চক্কোত্তির ঘরে অতিথ্ হয়।
- কেরোসিন ল্যাম্পের উপর আমাদের লণ্ঠনের আলো পড়িল।
- সান্‌লাইট সোপ্ নিয়েছিস?
- লুক বিফোর ইউ লিপ।
- 'জার্ম' লোকের বিছানায় বজ্‌বজ্ করছে।
- ওষুধ দিয়ে কুইনিনের কয়েকটা পিল করে দেবখন্। ইত্যাদি।

এমন শব্দ-মিছিল লক্ষ্য করা যায় উপন্যাসে।

'ড্যাস' ('—') চিহ্নের ব্যবহারও রয়েছে বহু ক্ষেত্রে—

- বলিল—বড়ই অভিমান যে। —ডাকছি তা' আসা হ'চ্ছে না... ঢং দেখলাম বিস্তর। ... নেও হয়েছে, এখন এস। —না আমায় উঠতে হবে—"
- এখন সে কোথায়—কেমন তার দশাটা—কে জানে—
- মাখন বলিল,—উঠে কি ক'রবো?—

ইত্যাদি বর্ণনাকে প্রাঞ্জল ও বাস্তব জীবনঘেঁষা করবার স্বতঃস্ফূর্ততায় অজস্র প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন লেখক। যেমন—

- 'শ্বশুর ঘরই মেয়ে মানুষের তীর্থ্য।' — 'রোমন্থন'।
- 'চোরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া মাটিতে ভাত খাওয়া' —'দুলালের দোলা'।
- 'নরম কাঠে ছুতোরের বল' — 'দুলালের দোলা'।
- 'থাল ভরে' বেড়' ভাত আমি যুবতী,
  কাজে কর্ম্মে' বল' নাক আমি পোয়াতী।' —'যথাক্রমে'।
- 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।' —'কলঙ্কিত তীর্থ'। ইত্যাদি।

শুধুমাত্র বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যে নয়, এইভাবে আঙ্গিকগত ও ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও জগদীশগুপ্ত ছিলেন তাঁর কালের একেবারে স্বতন্ত্র ঔপন্যাসিক ব্যক্তিত্ব। ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্টতই লিখেছেন—

"... জীবনকে বাঁকা চোখে দেখেছেন বলেই জগদীশগুপ্তের গদ্যশৈলীতেও সাহিত্য সৃষ্টির প্রথাগত ভঙ্গি বর্জিত হয়েছে। একটি বস্তুবাদী মানুষ জগৎ ও জীবনকে যেভাবে দেখে সেইভাবেই তিনি দেখেছেন এবং নির্মোহ গদ্যভঙ্গিতে দেখিয়েছেন।"[১০৮]

তথ্যসূত্র :

১. পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, ড. তপোধীর ভট্টাচার্য, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পৃ. ৮৩।

২. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পত্রগুচ্ছ অংশ, গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৬০৮।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১১।

৪. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুবতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. ১৫৭।

৫. রচনাপ্রসঙ্গ ও রচনার প্রতিলিপি অংশ, দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা : রাজীব চৌধুরী, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩০৭।

৬. সূচনা, চোখের বালি, রবীন্দ্ররচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩৭৩।

৭. জগদীশ গুপ্ত, ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ২০০০, পৃ. ৬৬।

৮. উপন্যাসে তমসাবৃত জীবন : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ড. সরকার আবদুল মান্নান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৪০।

৯. জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য : ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে, ড. প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, বেস্ট বুক্স্, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৮৫।

১০. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ২৭৮।

১১. পত্র, জগদীশ গুপ্ত, আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ. ৫৮।

১২. ভিন্ন সন্ধান, ভিন্ন আঙ্গিক : উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত , জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, ড. সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৭৩।

১৩. Asects of the Novel, Doaba Publications, First Indian Edition, 2014, p. 28.

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

১৫. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ৬৩৮।

১৬. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৪১।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

১৯. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ২৭৬।

২০. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ২৩৫।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৩।

২২. বিধবা রতিমঞ্জরী, জগদীশ গুপ্তর গল্প, সম্পাদনা : সুবীর রায় চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ. ১।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

২৪. জগদীশ গুপ্ত গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ১৫৪।

২৫. জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, পৃ. ১০০।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

২৭. দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা : রাজীব চৌধুরী, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১০, পৃ. ১৪৮।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪।

৩১. জগদীশ গুপ্ত, সাহিত্য-অকাদেমী, নতুন দিল্লী, ২০০০, পৃ. ৯৮।

৩২. উপন্যাসে জীবন ও শিল্পী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, পৃ। ৪৯।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

৩৫. ১৯৪৬-৪৭, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৩৮।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৩৭. জগদীশ গুপ্ত : নারী ও সমাজচেতনা; জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য সম্পা: ড. সমরেশ মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২, পৃ. ১৯৮।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

৪১. স্ত্রীর চোখে লেখক জগদীশ গুপ্ত, বারোয়ারী শারদীয়া ৮, অশোক সেন সম্পাদিত, পৃ. ৪৫।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫।

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪।

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৮৬. দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা : রাজীব চৌধুরী, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৯৭।

৮৭. প্রাগুক্ত, ১২৯।

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

৮৯. দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা : রাজীব চৌধুরী, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৫৫।

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

৯৯. (গদ্যে চিত্রকল্প : প্রসঙ্গ জগদীশ গুপ্ত) জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, সম্পাদনা : সমরেশ মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২২০।

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭।

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।